প্রচ্ছন্ন

বিমল কর

এ ১২৫, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭

শ্রীসুনীল দাশ
কল্যাণীয়েষু

আমাদের প্রকাশনায় এই লেখকের অন্যান্য বই

খড়কুটো
গ্রহণ
বালিকা বধূ
পরিচয়
পূর্ণ অপূর্ণ
যদুবংশ
আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন
কুশীলব
একদা কুয়াশায়
মৃত ও জীবিত
ভুবনেশ্বরী
একা একা
অসময়
সান্নিধ্য
দংশন
মোহ
দ্বীপ
স্বপ্নে
ওয়াণ্ডার মামা [কিশোর উপন্যাস]
কাপালিকরা এখনও আছে
ঘুঘু (নাটক)

প্রচ্ছন্ন

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রমথ বলল, "আয় একটু মজা করি। মীরা তোকে কখনও দেখে নি। তুই একেবারে সামনে থাক, দরজার সামনে। আমি ওপরের সিঁড়িতে আড়াল মেরে দাঁড়িয়ে আছি। নতুন লোক দেখে মীরা চমকে যাবে।"

প্রমথর ফোলা-ফোলা গালে ছেলেমানুষের মতন কৌতুক উপচে পড়ছিল। সিঁড়িতে এখনও আলো জ্বলে নি, বেশ ঝাপসা হয়ে রয়েছে জায়গাটা। বাইরে শেষ মাঘের মরা আলো।

কলিং বেলের বোতাম টিপল প্রমথ। তার বোতাম টেপার একটা বিশেষ রীতি আছে—প্রথমে একটানা, তারপর ছেড়ে দিয়ে দুবার ছোট ছোট আওয়াজ তোলা। মীরা বুঝতেই পারবে প্রমথ এসেছে।

বেল টিপেই প্রমথ তেতলার সিঁড়ির দিকে দু' ধাপ উঠে গেল। উঠে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। সুরপতি দরজার সামনে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই প্রমথ নীচু গলায় বলল, "তুই কিছু বলবি না।"

সুরপতি এই ছেলেমানুষির মানে বুঝছিল না। শুধু অনুভব করতে পারছিল, প্রমথ বেজায় খুশী হয়ে রয়েছে। দুপুর থেকেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। সুখে শান্তিতে থাকলে মানুষ হয়তো অনেক কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে। প্রমথকে দেখে সে-রকম মনে হয়। এখনও তার তাজা উচ্ছ্বাস রয়েছে, আন্তরিকতা রয়েছে।

ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হল। সুরপতি সোজাসুজি তাকাল।

দরজা খুলে মীরা যেন প্রমথকেই কিছু বলতে যাচ্ছিল, সুরপতিকে দেখে বোকার মতন চুপ করে গেল। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার আচমকা খেয়াল হল, বাথরুম থেকে বেরিয়ে শাড়িটাও ভাল করে গায়ে জড়াতে পারে নি, গায়ের শাড়ি অগোছালো, নীচের জামা ভিন্ন কিছু পরা হয় নি, কানের পাশে অল্পস্বল্প সাবানের ফেনা থাকলেও থাকতে পারে। ঠিক যতটা দরজার মুখোমুখি এসেছিল মীরা, যেভাবে একটা পাললা হাট করে খুলে দিয়েছিল, প্রমথকে না দেখতে পেয়ে, তার বদলে একেবারে অজানা একজনকে দেখে, এবার প্রায় ততটাই পিছিয়ে গেল। এলো শাড়ি টেনে হাত বুক আরও ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছিল।

"কাকে খুঁজছেন?" মীরা বলল।

সুরপতি কোনো কথা বলল না। প্রমথ বারণ করেছে।

মীরা আরও লক্ষ করে সুরপতিকে দেখতে লাগল, যেন এই সন্ধ্যের মুখে

যে-লোকটা ভদ্র বেশ পরে তার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে চোর-বদমাশ কিনা! মীরার চোখে সন্দেহ এবং বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। হয়তো খানিকটা আতঙ্কও।

সুরপতি সিঁড়ির দিকে তাকাল, প্রমথ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, বেশ মজা পাচ্ছে। ঘাড় নেড়ে কিসের যেন ইশারা করল।

সুরপতি বুঝতে পারল না। মনে হল, প্রমথ তাকে কথা বলতে বলছে।

"আমি সুরপতি।"

"সুরপতি! কে সুরপতি?"

"প্রমথর বন্ধু।"

"উনি এখনও বাড়ি ফেরেন নি।" মীরা শক্ত গলায় বলল। বলে দরজার পাললায় হাত দিচ্ছিল যেন এখুনি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে।

সুরপতি বলল, "ফেরার কথা।"

"না।'

মীরা বিরক্ত হয়ে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ প্রমথ প্রায় লাফ মেরে সিঁড়ি থেকে নেমে পড়ল। তারপর হোহো হাসি। হাসতে হাসতে তার পিঠ নুয়ে গেল। হাতের অ্যাটাচি কেস দুলতে লাগল।

সুরপতিকে পেছন থেকে ঠেলে দিয়ে প্রমথ ঘরে মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মীরা অপ্রস্তুত। কিছুটা যেন রুষ্ট।

প্রমথ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল. "কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বলো! বোকা বানিয়ে দিয়েছি।"

কোনো সন্দেহ নেই মীরা বোকা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই তামাশার কি দরকার ছিল! ছেলেমানুষি করার বয়েস তাদের নেই।

অ্যাটাচি কেসটা সোফার ওপর প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রমথ তার মোটা গোলালো গলায় বলল, "আমার বন্ধু সুরপতি। তুমি নিশ্চয় কয়েক শ' বার ওর কথা শুনেছ!"

মীরার এবার মনে পড়ল, হ্যাঁ—নামটা সে শুনেছে। মনে পড়ছে যেন—শুনেছে। তখন মনে পড়ে নি। বা মনে পড়লেও বোঝে নি। আচমকা কাউকে দেখলে, কিংবা কারুর নাম শুনলে চেনা মানুষকেও অনেক সময় ধরা যায় না।

মীরা আড়ষ্টভাবে. গায়ের শাড়ি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে. সামান্য হাত তুলে নমস্কার করল। বলল, "ও!"

সুরপতিও প্রতি-নমস্কার জানাল।

"বসুন আপনারা, আমি একটু কাজ সেরে আসছি।" মীরা চলে গেল।

প্রমথ গলার টাই খুলছিল। "মীরা একেবারে থ' মেরে গেছে।" যেন বউকে

থ' মারানো এক বিরাট রসিকতা—প্রমথ সেইভাবে বলল, হাসিমুখে, মজার গলায়। "বুঝলি সুরপতি, যখনই পুরোনো কথাটথা হয়, কলেজ-ফলেজ, ফুর্তি-ফার্তার কথা—আমাদের সেই ওল্ড ডেজ্—চালাও পানসি বেলঘরিয়া—তখনকার কথা উঠলেই তোদের কথা বলি। তুই, ত্রিদিব, সেই হাড় হারামজাদা কল্যাণ—তোদের গল্প বলি। বলে বলে ব্যাপারটাকে একেবারে লিভিং করে ফেলেছি। মীরা তোদের নাড়িনক্ষত্র বলে দিতে পারে।"

সুরপতি ঠাট্টার গলায় বলল, "তোর বউ কিন্তু আমার নামটাও চিনল না।"

'আরে না না, ভড়কে গেছে। দরজা খুলে দুম করে চোখের সামনে নিজের কর্তার বদলে অন্য পুরুষ দেখলে কোন মেয়েছেলে না ভড়কে যাবে!" প্রমথ হা-হা গলায় হেসে উঠল।

সুরপতি হেসেই বলল "তুই বলছিস কি! দরজা খুলে তোর বউ কি শুধু তোকেই দেখে?"

প্রমথ কোট খুলে ফেলল। বলল, 'দরজা খুললেই ধোপা নাপিত কাগজঅলা দেখবে বলছিস? আরে না, কর্তার আলাদা সিগন্যাল—" বলে চোখ টিপে আবার হাসি। "আরে তুই বোস, বোস, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি!"

সুরপতি কোনাকুনি সোফাটায় বসল। প্রমথ বড় সোফায় বসবার আগে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, ওয়ালেট বার করে নিল। সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার ছুঁড়ে দিল সুরপতির দিকে। 'সিগারেট খা!"

সুরপতি মোটামুটি এই ঘরের চেহারা থেকে প্রমথর অবস্থাটা অনুমান করে নিতে পারছিল। আজকালকার মাঝারী ভদ্রলোকরা যেমন হয় তেমন আর কি, ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস, মধ্যবিত্ত গৃহসজ্জা।

প্রমথ পিঠ নুইয়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বলল, "আমার বউকে কেমন দেখলি?"

সুরপতি কোনো জবাব দিল না; না দিয়ে সিগারেট ধরাতে লাগল।

"কি রে পছন্দ হল না?" প্রমথ ঠাট্টা করল।

সুরপতি হেসে বলল, "তোর বউ বেশ সুশ্রী।"

'সুন্দরী বলবি না বুঝি?" প্রমথ এবার সোজা হয়ে বসে বন্ধুর চোখে চোখে তাকিয়ে ক্ষুণ্ণ হবার ভান করল।

সুরপতি হাসল। "বউ নিয়ে তুই খুব সুখী।"

"খু-ব কি রে, একেবারে কানায় কানায়। দে, প্যাকেটটা ছোঁড়।...আমার মেয়ে কোথায় থাকে তোকে বলেছি না?"

"দারজিলিঙে।"

"তা হলে তো বলেইছি। ঝুনু দারজিলিঙে। আমার এক ভায়রা থাকে

ওখানে, পুলিশের চাকরি। তাকে লোক্যাল গার্জেন করে দিয়েছি, হোস্টেলে থাকে। ভালই আছে বুঝলি। লেখাপড়াই বল আর এই তোর ডিসিপ্লিন-ফিসিপ্লিন বল—এসব ভাই এখনও ওই সাহেবব্যাটাদের হাতে রয়েছে খানিকটা। আমাদের ব্যাপারটা হল দমকলের, সব সময়েই আগুন জ্বলছে আর ঘণ্টা বাজছে।” প্রমথ হাসতে লাগল।

“তোর ছেলে কই?”

“ছেলের কথা বলিস না, ওটার আমি নাম দিয়েছি স্যাটিলাইট। আমরা কিছু নয়। সে-ব্যাটা কিছুতেই আমাদের কাছে থাকবে না, জন্মের পর থেকে তার দিদিমার ন্যাওটা হয়েছে। ব্যাটাকে এখানে রাখাই যায় না। জোর করে রাখতে গেলেই তার মাকে দুমদাম মারবে, আমার পেট ফাটাবে, ঘরের জিনিস-পত্তর ভাঙবে চুরবে। ব্যাটা ডাকাত ভাই। ওটাকেও দারজিলিঙে পাঠিয়ে দেব, একেবারে বাচ্চা—আর-একটু বড় হোক।”

সুরপতি সিগারেটের ছাই ফেলল, বলল, “তোর এই ব্যাপারটা তা হলে কমপ্লিট হয়ে গেছে?”

“কোন ব্যাপার?”

“ছেলেমেয়ে,” সুরপতি মুচকি হাসল।

“ও! বাচ্চাকাচ্চা বলছিস! হ্যাঁ, কমপ্লিট। ইট'স এনাফ্। এক মেয়ে এক ছেলে। বারো বছরে। তুই একটা অ্যাভারেজ করে দেখ...।” প্রমথ হাসল।

সুরপতি পরিহাস করে বলল, “অ্যাভারেজ ভাল। কিন্তু তুই দুটোকেই তো দারজিলিঙে পাঠাবি। সাহেবী কেতা ধরাবি। আমি বলছিলাম—দেশীয় প্রথায় দেখবার জন্যে আর একটা রাখলে পারতিস। একটা এক্সপেরিমেণ্ট।”

প্রমথ বেজায় জোরে হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, “না ভাই, আর নয়; যথেষ্ট। আমার বউ অত সুজলাসুফলা নয়।”

সুরপতি হেসে ফেলল।

প্রমথ তার টাই, কোট, অ্যাটাচি, এমন কি খুলে রাখা জুতো জোড়াও বাঁ হাতে তুলে নিল। বলল, “তুই বোস সুরপতি, আমি ধড়াচুড়ো ছেড়ে আসি। মীরাকে একটু ম্যানেজ করতে হবে। খেপে গেছে বোধ হয়।”

প্রমথ চলে গেল। যাবার আগে বিচিত্র ভঙ্গিতে কনুই দিয়ে আলোর সুইচটা নামিয়ে দিল।

সুরপতি ঘোলাটে ধরনেব অন্ধকার আর দেখতে পেল না। আলো জ্বলে ওঠায় এই ঘর স্পষ্ট ও প্রখর দেখাল। সুরপতিও যেন এক-ধরনের তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে এতক্ষণে স্পষ্ট করে এই ঘরের চেহারাটা দেখছে। ঘাড় মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুরপতি কয়েক মুহূর্ত সব দেখল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে।

ঘর কিছু বড় নয়, আসবাব সে-তুলনায় কিছু বেশী। সোফাটোফা ছাড়াও একটা সোফা-কাম-বেড রয়েছে, গ্লাস কেস, ছোটখাট বাজারী জিনিস সাজানো। ছোট মাপের রেডিওগ্রাম, বিষ্টুপুরী ঘোড়া, জয়পুরী ফুলদানি, দেওয়ালে দু'-একটা বাঁধানো ফোটোর পাশে পেপার পাল্পের মুখোশ। আরও কিছু টুকিটাকি।

যে কোন বাঙালী মধ্যবিত্ত ছেলে মাঝারী মাপের আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করার পর চলতি রুচিটাকে যেভাবে গ্রহণ করবে প্রমথ সেইভাবেই গ্রহণ করেছে। কোনো নতুনত্ব নেই। সুরপতি যদি বেলতলায় ত্রিদিবের বাড়ি যায় তার বসার ঘরে প্রায় সবই এই একইভাবে সাজানো দেখবে। প্রমথ বলছিল, ত্রিদিব এখন বেলতলায় থাকে।

প্রমথ এখন ঠিক কতটা রোজগার করছে জানার দরকার নেই। সুরপতি মোটামুটি অনুমান করতে পারে। এবং বুঝতে পারছে, যাকে চলতি কথায় সুখসাচ্ছল্য বলা যায় প্রমথ তা আয়ত্ত করেছে। একদিন, যখন প্রমথ কলেজে পড়ত তার বাবা বেল স্কুলে মাস্টারি করতে করতে হুট করে মারা গেল তখন বেচারীর এমন অবস্থা যে হস্টেলের খরচ জোটাতে পারত না। কল্যাণ তাকে কোথাকার এক বাজরাজড়ার অনাথালয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, ছোকনু পাঁড়ের হোটেলে খেত প্রমথ। বন্ধুবান্ধবরা তাকে নিজেদের জামা-প্যাণ্ট চটিফটি দিয়ে দিত। বছর দেড়-দুই প্রমথ খুবই কষ্ট করেছিল। কিন্তু ছেলেটা ভাল ছিল। ভাল মানে হুজুগে, হুল্লোড়ে, সবল গোছের। প্রমথর বড় গুণ ছিল—সে অভিমানী ছিল না, সঙ্কোচ করত না, বন্ধুদের কাছে তার কোনো রকম লজ্জা ছিল না। সুরপতি তখন এতোটা বোঝে নি, তবু বুঝতে পারত—দমে যাবার ছেলে প্রমথ নয়।

প্রমথ যে দমে যায় নি—আজকের অবস্থাই তার প্রমাণ। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল না। একেবারে পার্থিব কিছু সুখসুবিধে লাভ করার বাইরে প্রমথর চোখ যেত বলে মনে হয় না। সুরপতির মনে হল, যা পাবার কিংবা প্রত্যাশার—তার কিছু বেশীই লাভ করেছে প্রমথ। অন্তত তার স্ত্রী।

প্রমথর বউ সত্যিই সুরপতিকে অবাক করে দিয়েছে। খুঁটিয়ে দেখলে প্রমথর স্ত্রীকে নিখুঁত সুন্দরী কি বলা যায়? কোথাও খুঁত রয়েছে, যেমন সুরপতির মনে হয়েছিল, মহিলার নাক একটু বেশী লম্বা, অত্যন্ত তীক্ষ্ন দেখায়। এতটা তীক্ষ্নতা হয় রুক্ষতা না-হয় অতিরিক্ত সচেতনতার মতন দেখায়। কপাল আরও একটু চওড়া হলে ভাল হত, সরু ছোট কপাল হওয়ায় কেমন একটু অহমিকার ভাব হয়েছে। গলার দিকটা সামান্য মোটা, আরও পাতলা হলে ভাল মানাত। এই রকম ছোট ছোট খুঁত আছে প্রমথর স্ত্রীর। সুরপতি অল্প সময়ের মধ্যে যা দেখেছে—তাতে তার ওই রকম মনে হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে, এটাও অনুভব করেছে—মহিলার শরীরের গড়ন পরিষ্কার, মাথায় মাঝারী, ঈষৎ গা-ভারী, বয়েসে হয়তো, কাঁধ ঘাড় সুন্দর। সুরপতি মেয়েদের মুখ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বোঝে না, যানে সৌন্দর্য ঠিক কোথায় থাকে, চোখে না দৃষ্টিতে, ঠোঁটের গড়নে না হাসিতে, কথা বলার সময় গলার স্বরে না বলার ভঙ্গিতে—তা সে বলতে পারবে না। কিন্তু এর কোথাও, হয়তো সমস্ত জড়িয়ে, কিংবা যে যা চায়—সেই পছন্দ মতন জায়গায় প্রাপ্য পেয়ে গেলে তার ভাল লাগে। প্রমথর স্ত্রীর মুখে সুরপতি এই রকম একটা প্রাপ্য পেয়েছে। তার ভাল লেগেছে। প্রমথর পক্ষে এমন বউ পাওয়া ভাগ্য, বড় রকমের ভাগ্য।

মীরার পায়ের শব্দ হল, তাকাল সুরপতি।

এখন আর কোথাও অগোছালো ভাব নেই মীরার। তার চুলের বড় খোঁপা ঘাড়ের দিকে সামান্য নামানো, মুখ মোলায়েম, উজ্জ্বল ফরসা রঙের কোথাও কোথাও লালচে আভা ফুটেছে, চোখ আরও টানা-টানা লাগছিল।

মীরা প্রমথর মতন বড় সোফাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সুরপতি ঠিক উঠে দাঁড়াল না, সোজা হয়ে বসল।

মীরা বলল, "উনি আসছেন," বলে হাসির মুখ করল।

সুরপতি লক্ষ করল, প্রমথর স্ত্রী প্রথমে যে-শাড়িটা পরে ছিল, এখন সেটা নেই। উজ্জ্বল হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে, কালো নকশা করা পাড় শাড়িটার। গায়ের জামাটাও সোনালী-হলুদ। প্রথম সন্ধ্যার এই জ্বালানো আলো, যা যথেষ্ট উজ্জ্বল, প্রমথর স্ত্রীর ফরসা রঙের ওপর হলুদের আভা ছড়াচ্ছে। আরও ফরসা, ঝকঝকে দেখাচ্ছে ওকে।

মীরা বসল। বসে দু' মুহূর্ত যেন নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যে অপেক্ষা করল। তারপর বলল, "আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

সুরপতি কিছু বলল না।

মীরা নিজেই আবার বলল, "আপনার বন্ধুর কাণ্ডই ওই রকম। এমন বিচ্ছিরি ব্যাপার করে।"

সুরপতির মনে হল, মীরা তার তখনকার অপ্রস্তুত ভাব, আড়ষ্টতা কাটিয়ে ফেলেছে। বাজে রসিকতার জন্যে প্রমথকে নিশ্চয় ছেড়ে দেয় নি, কিছু বলেছে —এ-সব ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বভাবতই যা আড়ালে বলে। মীরা যে অত্যধিক লাজুক নয়, অচেনা পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত, বেশ সপ্রতিভভাবে কথা বলছে সুরপতির তাতে সন্দেহ হল না।

"আপনি নাকি বেশ কিছু দিন হল কলকাতায় এসেছেন?" মীরা বলল, বলে তাকিয়ে থাকল।

সুরপতি মাথা নাড়ল।—"মাস চার-পাঁচ।"

"এতোদিন এসেছেন, কই এঁদের খোঁজ খবর করলেন না কেন?"

"ঠিক পেরে উঠি নি," সুরপতি বলল।

মীরা তার পা কাঁপাল, হাঁটু দুটো জোড়া করল, একটা হাত কোলের ওপর, অন্যটা সোফার ওপর—হাতের আঙুল ছড়ানো, আলতো চাপ দেওয়া। চুড়িগুলো আলগা ঢলঢলে নয়, কব্জির কাছাকাছি আঁট হয়ে রয়েছে। আঙটিটাও নজরে পড়ছিল। কালো পাথর। বড়। চৌকো।

"না পারার কি ছিল," মীরা বন্ধুপত্নীর সৌজন্য রেখে বলল, "আপনারা সব এত বন্ধু ছিলেন—কলকাতায় এসে খোঁজখবর করবেন না?"

সুরপতি একটা গন্ধ পাচ্ছিল। সুগন্ধ। জোরে নিঃশ্বাস নিল না, আস্তে আস্তে গন্ধটা টানতে চাইল। "অনেক দিনের কথা," সুরপতি বলল, "দশ-পনেরো বছর পরে ফিরে এসে কাউকে পাওয়া যায় আমি ভাবতে পারি নি।"

মীরা গলার ওপর দিকে আঁচলের পাড় একটু টানল। "দশ-পনেরো বছর এমন কি! বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরেও মানুষ মানুষকে খুঁজে পায়।"

সুরপতি হাসল। শব্দ করে নয়। "পায়?"

মীরার চোখের মণি নড়ল।

'বাঃ, পায় না। একই জায়গায়, একই বাড়িতে লোকে কতকাল থেকে যায়।'

সুরপতি তর্ক করল না। মীরার বাহুর পেলবতা দেখতে লাগল।

"আপনি এতোকাল বেনারসেই ছিলেন?" মীরা জিজ্ঞেস করল।

"কে বলল?"

"আপনার বন্ধু বলছিলেন।"

"প্রমথ বেনারসের কথা বলেছে। আমি আরও অন্য অন্য জায়গাতেও ছিলাম।"

"কোথায় কোথায়?"

"পাটনায়, রাঁচিতে; কিছুদিন মিরজাপুরে।"

মীরা এবার পায়ের ওপর পা করে বসল, হাত দিয়ে শাড়ির তলার দিকটা ঠিক করল। পা কাঁপানো মীরার স্বভাব। তার পা নাচছিল।

"কলকাতায় কোথায় যেন রয়েছেন শুনলাম—!"

"কলকাতায় নয়, কাছাকাছি, ব্যারাকপুরে।"

"ব্যারাকপুর—গান্ধীঘাট" মীরা গালে টোল ফেলল। তার গালে, বাঁ গালে টোল উঠত হয়তো কোন দিন, এখন ভারী গালে ভাঙা টোল ওঠে।

সুরপতি বলল, "প্রমথকে আজ হঠাৎ পেয়ে গেলাম। সে-ই পেল আমাকে বলা যায়। কেমন করে চিনতে পারল কে জানে! প্রমথর মেমারি ভাল।"

"শুনলাম। অফিসে দেখা।"

"ওরই অফিসে।"

ভেতর থেকে প্রমথর গলা শোনা গেল। ডাকছে।

মীরা বলল, "আপনি বসুন। উনি আসছেন। আমার চায়ের জল বোধ হয় ফুটে শুকিয়ে গেল।"

মীরা চলে গেল। যাবার সময় পিঠের আঁচল এমনভাবে টানল যে, সুরপতির মনে হল খুব হালকা ভাব রয়েছে মীরার।

সুরপতি বসে থাকল; অন্যমনস্ক। মীরা চলে যাবার পরও তার বসার জায়গায় মীরার একটা কাল্পনিক অস্তিত্ব যেন থেকে গেছে, সুরপতি সেইভাবে তাকিয়ে থাকল। নাকের কাছে আর কোনো গন্ধ আচমকা বাতাসে ভেসে আসছে না, তবু সে কখনও কখনও জোরে শ্বাস টানছিল।

সামান্য পরেই প্রমথ এল। অন্য চেহারা। চোখমুখ সতেজ। মাথার চুল আঁচড়ানো। পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবি। বউয়ের একটা মেয়েলী চাদর গায়ে জড়ানো।

কলকাতায় এখন মরা শীত। দুপুরের রোদে তাত ফুটেছে, বিকেলেও শীত বোঝা যায় না। বসন্তের একটু আধটু বাতাস যেন প্রায়ই গায়ে লাগে।

"তুই এবার ফ্রেশ হয়ে নে—" প্রমথ বলল, "কি পরবি? ধুতি না পাজামা?"

সুরপতি তাকাল। "মানে?"

"জামাটামা ছাড়। বাথরুম খালি। চল...।"

"ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না," সুরপতি সাধারণভাবে বলল।

প্রমথ আরও দু' পা এগিয়ে এল। "বোঝার কি আছে! আজ তুই এখানে থাকবি। চল হাতমুখ ধুয়ে এসে জামাটামা ছেড়ে আরাম করে বোস। চা-ফা খাই। তারপর জমিয়ে বসব। তুই আমি আর মীরা।"

সুরপতি যেন ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করল। বলল, "সে কি রে, আমি ফিরব না?"

প্রমথ মোটেই কানে তুলল না কথাটা। "রেখে দে তোর বাড়ি। আজ শালা আমরা জমাব। কত বচ্ছর পরে তোকে ক্যাচ্ করলাম। বিলিভ মী সুরপতি, আমার যা আনন্দ হচ্ছে! তোর সঙ্গে দেখা হবে—মাইরি আমি ভাবি নি। কোনো ব্যাটা তোর খবর জানত না। আমি তো ভাবতাম তুই মরেই গিয়েছিস।" বলে প্রমথ হো-হো করে হাসল।

সুরপতি প্রমথর হাসি শেষ হবার অপেক্ষা করছিল। প্রমথ থামল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর সুরপতি বলল, "আমি কিন্তু মরেই গিয়েছি প্রমথ।"

"নেভার মাইন্ড, তোকে জ্যান্ত করে দেব।"

"আমায় আজ ছেড়ে দে।"

"বাজে বকিস না। তুই আজ থাকবি। আমরা আজ সেলিব্রেট করব,

পুরোনো বন্ধুকে ফিরে পাবার হুল্লোড়।.. তুই কি খাস? আমাব কাছে ভাল জীন আছে। যদি হুইস্কি প্রেফার করিস—সাপ্লাই কবতে পাবব।'

সুরপতি বুকের মধ্যে কোথাও যেন মৃদু বেদনা অনুভব করল। 'আজ আমায় যেতে দে। তোর বাড়ি চিনে গেলাম। আবার একদিন আসব।"

প্রমথ বন্ধুর এই অসম্মতি আব সহ্য করতে পাবল না। সুরপতির কাছে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে ওঠাবাব ভঙ্গি করে দাঁড়াল। "একবাব কেন হাজাব বার আসবি। কিন্তু এখন ওঠ, বাথরুম থেকে আয়। চা-ফা খা। আজ আমি তোকে ছাড়ছি না।"

সুরপতি আবও কিছু বলবে ভাবছিল, দেখল দরজার সামনে মীরা এসে দাঁড়িয়েছে। সুরপতিকেই দেখছিল।

সুরপতি উঠে দাঁড়াল। বলল, "বেশ। থাকব।"

দুই

মুখে মাছের কচুরি; পাকা রুই মাছের পুর, আদা-পেঁয়াজ মেশানো। স্বাদটা জিবে জড়ানো ছিল প্রমথর। হাতের ইশারায় তার কাপে আরও খানিকটা চা ঢেলে দিতে বলল স্ত্রীকে। সুরপতিকে বলল, "তুই তা হলে জীবনে করলি কী?"

সুরপতি ধীরেসুস্থে খাচ্ছিল। সারা দিনের পর ঠাণ্ডা জলে সে অর্ধ-স্নান করেছে। পরনে প্রমথর ধুতি দু' পাট করে পরা, গায়ে প্রমথরই ধোয়ানো গেঞ্জি, সাদা শাল—সেটাও বন্ধুর। শরীরে যে ক্লান্তি ছিল, ধুলো ময়লার মালিন্য—এখন তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঠিক রুক্ষতা নয়, রুক্ষতার মতন একটা কষা ভাব চোখ নাক এবং স্নায়ুকে যেন কিছুটা উগ্র করে রেখেছিল আগে, জ্বালার অনুভূতি ছিল সামান্য। সুরপতি এখন নিজেকে ঠাণ্ডা, স্বাভাবিক মনে করছিল। আরাম আর আলস্য লাগছিল। মাঝে মাঝে প্রমথর শালে নেপথলিনের গন্ধ উঠছে ফিকে ভাবে।

সুরপতি বলল, "কিছু নয়", বলে পাতলা করে হাসল, মীরাকে দেখল। প্রমথকে বলল, "তোকে দেখে ভালই লাগছে।"

প্রমথ পা দুটো আরও ছড়িয়ে দিল আলস্য করে। "আমাকে ভাল লাগবেই। ভাল লাগার ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি ভাই। আমাদের একজন একজি-কিউটিভ ছিল। সত্য মৌলিক, মৌলিকসাহেব বলত : নিজেকে প্রপার ব্যাক-গ্রাউণ্ডের ওপর প্লেস করতে পারলেই বাজারে বিকিয়ে যাবে। গয়নার দোকানে যাও, দেখবে ভেলভেটের ওপর পাথরটাথর রেখে দেখায়। ইমিটেশান আর আসল পাথর—কোনটা কী তুমি আমি বুঝব না।...আসল কথাটা ওইখানে সুরপতি, নিজেকে প্রপার ব্যাকগ্রাউণ্ডে প্লেস করা।"

মীরা স্বামীর কাপে দুধ চিনি মিশিয়ে সুরপতির দিকে তাকাল। "আপনাকেও আর-এক কাপ দিই?"

"দিন, পুরো নয়।"

"জীবনটাকে আমি গুড লিভিং অ্যাণ্ড হ্যাপি কনজ্যুগ্যাল লাইফের ওপর প্লেস করে দিয়েছি বুঝলি, সুরপতি।" প্রমথ চায়ের কাপ তোলার সময় স্ত্রীর হাঁটুর ওপর হাত দিল একটু, হাসল—"আমার বউই আমার ফ্যুয়েল।" প্রমথ নিজের রসিকতায় নিজেই হোহো করে হেসে উঠল।

মীরা কটাক্ষ করে বলল, "কি যে কথা বলার বাহার তোমার!"

"কথাটা মিথ্যে বলেছি! তুমিই যে আমার—কি বলব—গাইডিং ফোর্স—মানে প্রেরণাট্রেরণা সেটা সুরপতি বুঝে ফেলেছে। কিরে সুরপতি, তুই এগ্রি করছিস?"

সুরপতি কিছু বলল না। হাসল। মীরা তার চায়ের কাপ ছোট তেপায়ার ওপর রেখেছে। ও কিছু খাচ্ছে না। শুধু চায়ে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। মীরার নাকের ওপর দিকে একটা লালচে আঁচিল খুব কালো না দেখানোয় লালচেই দেখাচ্ছিল। কানের ঘন খয়েরি পাথর দুটো সামান্য বড়, মোলায়েম মীরার গালের মসৃণতার সঙ্গে মানিয়ে যাচ্ছিল।

মীরা বলল, "আপনার বন্ধুর বিচ্ছিরি দোষ কি জানেন? বড় কথা বলে।"

প্রমথ চায়ে চুমুক দিয়েছিল। চট করে ঢোঁক গিলে ফেলল। বলল, "বা বা, কথা বলব না। কথা বলেই খেয়ে পরে বেঁচে আছি। কথা বলাই আমার প্রফেসান।"

"তুই কি বরাবরই তোদের কম্পানীর সেলস প্রমোসান নিয়ে রয়েছিস?" সুরপতি জিজ্ঞেস করল।

"ফর দি লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স," প্রমথ বলল। "আরে প্রথমে তো আমি ভেরাণ্ডা ভেজেছি। চাকরির বাজার কী টাইট, এক একটা ইণ্টারভ্যু ইয়ার করা কোট প্যান্ট চাপিয়ে শালা হনুমানের বাচ্চার মতন ছুটি—" বলতে বলতে প্রমথ মীরার দিকে একবার তাকিয়ে নিল—শালা শব্দটা এখানে পছন্দ করবে না মীরা, অবশ্য বিছানায় সোহাগ আদরের বাড়াবাড়ির সময় প্রমথ যে ঠিক কোন গভীরতা থেকে মীরাকে অভব্য কথাটথা বলে ফেলে সে জানে না। মীরা আপত্তি করে না, কিংবা অখুশী হয় না। প্রমথর কোনো সন্দেহ নেই, বিছানার জন্যে কিছু কিছু শব্দ আছে যা কানে লাগে না। মতান্তরের মধ্যে প্রমথ আবার কথার খেই ধরতে পারল। "তুই বিশ্বাস করবি না সুরপতি, এক একটা ইণ্টারভ্যু আমার বডি ফ্লুইড 'নিল' করে দিত। আমি মাঘ মাসে দুবার গঙ্গা সাঁতার দিতে পারি, কিন্তু ওই ইণ্টারভ্যু—হরিবল। সে যাক গে একবার কপাল ঠুকে এক বিলেতী কম্পানীতে অ্যাপলিকেসান লাগিয়ে দিলাম দিয়ে মনে মনে ঠিক করে নিলাম—চাকরি হোক আর না হোক, একেবারে ডেসপারেট হয়ে ঢুকে পড়ব ডাকাডাকি করলে। গড নোজ—হাউ ইট হ্যাপেণ্ড বাট দি মিরাক্যাল ওয়াজ দেয়ার। লেগে গেল চাকরি। পাক্কা দেড়টি বছর ঘোড়ার মতন দৌড় করিয়েছে ভাই, ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা। শরীর-ফরীর যায় তখন। তবে ব্যাপারটা শিখে গেছি। ওই চাকরি থেকে লাফ মেরে চলে এলাম ডি' বয়তে। ফ্রম দেয়ার আই কেম টু দিস ম্যানারস অ্যাণ্ড হ্যারিসন। তখনই বিয়ে করলাম। মেয়েটা হবার পর প্রমোসান। টুর ছিল। বউ হাঁসফাঁস করত।

অফিসে বললাম, হয় ট্যুর বন্ধ করো নয়ত কেটে পড়ব। কলকাতায় রেখে দিল। কিন্তু ঠেলে দিল ডেভালাপমেন্টে। দে—আমার কী! বছর তিন চার ওই ওয়ার্থ-লেস ডিপার্টমেন্টে রেখে আবার সেল্‌স প্রমোসানে নিয়ে এল। উইথ এ গুড লিফট।"

মীরা এবার খানিকটা অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বলল, "তোমার অফিসের গল্প থাক।"

"কে বলতে চেয়েছে! আমি?...সুরপতিকে বলো।"

সুরপতি চায়ের কাপ টেনে নিয়েছিল।

"আপনি ওকে আর অফিসের কথা বলতে বলবেন না, রাত ফুরিয়ে ফেলবে", মীরা সুরপতির দিকে চোখ রেখে কৃত্রিম মিনতির গলায় বলল।

সুরপতি হেসে বলল, "প্রমথ অফিস ভালবাসে।"

"ভালবাসি বলিস না, ভালবাসা দেখাই," প্রমথ সিগারেট ধরাল।

সুরপতি মীরার মুখেব দিকে তাকাল এক পলক।

মীরা বলল, "আমি উঠি। রান্না দেখতে হবে।"

"তোমার সেই রাধারানীটি কোথায়?"

"বাজারে পাঠিয়েছিলাম। ফিরেছে বোধ হয়।"

"আজ আমরা জমাব ভেবেছিলাম, তুমি থাকবে না?"

"আমার রান্নাঘর কে দেখবে?"

মীরা অভ্যাস মতন কয়েকটা প্লেট চামচ ট্রের একপাশে রাখল। পড়ে থাকল কিছু। প্রমথরা তখনও চা খাচ্ছে। মীরা উঠল। রাধা পরে এসে সব গুছিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রমথ বলল, "খানিকটা পরে তুমি একটু ইয়ের ব্যবস্থা করে দিও। আমরা দুজনে প্রাণের কথা বলব। কি বল সুরপতি?"

সুরপতি কথার জবাব দিল না।

মীরা চলে যাচ্ছিল, প্রমথ আবার বলল, "তুমি রান্নাঘরেই লটকে থেকো না ডিয়ার, মাঝে মাঝে এসে আমাদের কম্পানি দিও।"

চলে গেল মীরা। প্রমথ একমুখ ধোঁয়া বাতাসে উড়িয়ে দিল। "নে, সিগারেট নে সুরপতি।"

সুরপতি চা শেষ করে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল। কেমন যেন ঘুম ঘুম লাগছে। বোধ হয় এই বিশ্রাম ও পরিতৃপ্তির জন্যেই। মীরা মাছের কচুরিগুলো ভালই করেছিল। স্বামীর জন্যে তার আদর-যত্ন রয়েছে। প্রমথ অফিস থেকে ফিরে এসে কী খাবে, কোনটা পছন্দ করবে—মীরা আগে থেকেই বুঝে নেয়।

"সুরপতি?"

সিগারেটটা ধরিয়ে নিল সুরপতি। "বল।"

"তোর কথা শুনি," প্রমথ সোফার গায়ে পিঠ-মাথা হেলিয়ে দিল।

সুরপতি অন্যমনস্কভাবে সিগারেট খেতে লাগল। নেপথলিনের গন্ধটা আবার নাকে আসছিল তার। এই গন্ধটা তার পছন্দ হচ্ছিল না। মীরার জামা-কাপড়ে মাখানো সেই সেন্টের গন্ধকে যেন নষ্ট করার জন্যে এই গন্ধ।

"আমার কথা কী শুনবি?" সুরপতি বলল।

"কী করলি জীবনে?"

কী করেছে সুরপতি জীবনে? সামান্য ভাবল সুরপতি। জীবন শব্দটা শুনতে ভাল। যেমন জীবনপাত্র। জীবনপাত্র কথাটাই সুরপতির মনে এল। কিন্তু এর অর্থ কী? হাত পা মাথাটাথা নিয়ে বেঁচে থাকা? সকাল, সন্ধ্যে, রাত; দিন, মাস বছর—শুধু বেঁচে থাকা? সুরপতি অনেককাল বেঁচে আছে। পঁয়তাল্লিশ বছরের কাছাকাছি। যখনই সে ভাববার চেষ্টা করেছে, দেখেছে—জীবন বলে তার কিছু নেই; ফিতের মতন একদিকে তার জীবন খুলে—অন্যদিকে গুটিয়ে যাচ্ছে। হয়তো একদিন, দু' চার বছরের মধ্যে ফিতে ফুরিয়ে যাবে, কিংবা ছিঁড়ে যাবে।

"কী রে, চুপ করে আছিস যে?" প্রমথ বলল।

"কী বলব, ভাবছি।"

"রাখ তোর ভাবনা। কী করলি বল?"

"বলার মতন কিছু করি নি।"

"তুই কলেজফলেজ ছাড়ার পর মুর্শিদাবাদের দিকে কোথায় গিয়েছিলি না?"

"গ্রামে। মাস্টারী করতাম।"

"কেটে পড়লি?" প্রমথ নতুন করে একটা সিগারেট ধরাল, কুশানটা মাথার পাশে গুজে দিল।

"পড়লাম। হেড মাস্টারের বউ আমার বিছানায় মশারিতে আগুন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল।"

প্রমথ প্রায় লাফ মেরে উঠে বসল। "বিছানায় আগুন? বলিস কী? কেন কেন?"

সুরপতি সাদামাটা গলায় বলল, "হেড মাস্টারের চালা বাড়ির বাইরের দিকে আমি থাকতাম। কাছেই থাকত ইউনিয়ন বোর্ডের এক বঙ্কুবাবু আর তার এক বোন। হেডমাস্টারের বউ আমায় আদরযত্ন করবার চেষ্টা করত।"

প্রমথ সিগারেটের ধোঁয়া হুস করে উড়িয়ে দিল। ফুর্তির গলায় বলল, "বুঝেছি শালা, দু' দিকে দুই কলাগাছ...।'

সুরপতি বলল, "দু' চারটে জায়গায় চার ছ' মাস করে জল খেয়েছি।

তারপর বেনারস। আমার এক মাসতুতো বোনের সঙ্গে বোলপুরে দেখা। সে টেনে নিয়ে গেল বেনারস।"

"বোলপুরে কী করতে গিয়েছিলি?"

"একজন টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু করতে যাই নি, বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেকার মানুষ। ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বেনারসে আমার মাসতুতো বোনটোন থাকত। মেসোমশাই মারা গিয়েছিলেন। মাসিমা বেঁচে ছিল। ওদের মোটামুটি চলত। দুই বোন চাকরি করে। মাসিমা একটা ডিসপেনসারির পার্টনার ছিল। মেসোমশাই ছিলেন ডাক্তার—সেই সুবাদে।"

প্রমথ সিগারেট নিবিয়ে দিল। রাধা এসেছে। প্লেট, কাপ গোছগাছ করে নিচ্ছিল। সুরপতি চুপ করে থাকল। দেখল রাধাকে। মাঝবয়সী ঝি। বোধ হয় বিধবা। মিলের শাড়ি পরনে থাকলেও সিঁথি সাদা।

রাধা চলে যাবার পর প্রমথ বলল, "মালপত্তর নিয়ে আসি কি বল? তোর জীন চলবে, না, হুইস্কি?"

সুরপতি হাত নাড়ল।

"মানে, খাসটাস না?...সেকি রে সুরপতি? তুই..."

"খেতাম। অনেক খেয়েছি। আর খাই না।"

"যা যা, খাই না! শালা, বিবেকানন্দ সাজছিস? আজ তুই খাবি। ইউ মাস্ট। না খেলে মেজাজ আসবে না। তোকে পেয়ে যদি মেজাজ না আসে তবে শালা কিসের কাঁচকলা হল!"

প্রমথ উঠে পড়ল। মদ্যাদি আনবে।

সুরপতি সোফায় পিঠ হেলিয়ে দিল। শীত লাগছে না। চাদরটা তবু বুকের দিকে টেনে নিল। সেই নেপথলিনের গন্ধ। চাদরটা নিশ্চয় আলমারিতে পড়ে থাকে। কদাচিৎ হয়ত ব্যবহারের প্রয়োজন হয় প্রমথর। ধুতিটাও যেরকম ফরসা, সুরপতির ধারণা—প্রমথ ধুতিও বছরে এক আধ দিন পরে। প্রমথকে একসময় প্যান্ট পরানোর জন্যে বন্ধুরা সাধ্যসাধনা করত। মফস্বলের ছেলে, রেল স্কুলের মাস্টারের সন্তান, মফস্বলী স্বভাব ও আচার আচরণ নিয়ে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। মিলের ধুতি পরত মালকোঁচা মেরে, টুইলের শার্ট। বন্ধুরাই প্রমথকে শহুরে আদব-কায়দায় রপ্ত করিয়েছিল। আজ প্রমথ শহুরে বাতাসে—বাসী এবং ফ্যাকাশে মধ্যবিত্ত সাহেবিআনায় বেশ মানিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

সামান্য চোখ বুজে থাকল সুরপতি। এখনও তার ঘুম ঘুম লাগছে। এই আরাম না আলস্যের জন্যে কে জানে।

চোখ খুলতেই আলোটা চোখে পড়ল। বসার ঘরে প্রমথ টিউব লাইট রাখে নি। দেওয়াল গাঁথা আলো, মোমদানের মতন একটা শেড, সাদা কাচ,

গায়ে নকশা। আলোটা ভাল লাগছিল সুরপতির।

ভাল লাগছিল বলেই সুরপতি আলস্যে হাই তুলল। চোখের পাতাও সামান্য বুজে এল। আর আচমকা এক গ্রাম্য স্মৃতির ঝাপটায় সুরপতি যেন চোখ বুজে ফেলল। কোনো কিছুই উজ্জ্বল নয় প্রখর নয়, স্তিমিত আলোয় পুরোনো পটের মতন অস্পষ্ট হয়ে একপাশে পড়ে আছে স্মৃতি। খড়ের চালা দেওয়া ঘর, দালানের খানিক পাকা, খানিকটা কাঁচা। আমঝোপের দিকে ছোট ঘর সুরপতির। আলকাতরা মাখানো দেড় হাতি জানলা মাথার দিকে। জানলা খুললেই—আমঝোপ চোখে পড়ে, ঝোপের শেষে রুক্ষ মাঠ।

সুরপতি জানলা খুলে বসে আছে। আমঝোপের ছায়ার ওপারে রোদ-পোড়া মাঠ. বৈশাখের তপ্ত হাওয়া আসছে ধুলো উড়িয়ে। বঙ্কুবাবুর বোন, যার গায়ের রঙ দেখে সুরপতির মনে হত—পাকা বেলের রঙের মতন হরিদ্রাভ, সেই বোন—তরুলতা ওই খাঁ খাঁ দুপুরে আমবাগানের দিকে হেঁটে আসছে। তরুর বাঁ পার অর্ধেকটা আছে, বাকিটা নেই। গ্যাংগ্রীণ হয়ে যাচ্ছিল বলে কেটে বাদ দিতে হয়েছে ছেলেবেলায়। তরু কাটা পা নিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে আসছিল। হাঁটার সময় শরীরের প্রায় সবটাই দুলে উঠছে, ঝাঁকি খাচ্ছে। তার এলানো চুল, খাটো শাড়ি আমবাগানের ছায়ায় এসে বাতাসে সামান্য বিপর্যস্ত হল। বোধ হয় ঘামছিল তরু। দাঁড়িযে দাড়িয়ে শাড়ির আঁচল আলগা করে গলা মুখ মুছে নিচ্ছে, হঠাৎ এই তল্লাটের খেপা কুকুরটা আমবাগানের কোন আড়াল থেকে ছুটে এল। তরু কিছু খেয়াল করার আগেই তার ক্রাচ ছিটকে গেল, কুকুরটা মাঠের দিকে, আব বেচারী তবু মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে বিশ্রী ভাবে।

সুবপতি যখন ছুটে এসে সামনে দাঁড়াল তখনও তরু মাটিতে শাড়ি এবং সায়ার আড়াল থেকেও তরুর একটা কাটা পা দেখা যাচ্ছিল।

প্রমথ এসে পড়ল।

"তোর জন্যে হুইস্কিই আনলাম." প্রমথ সেণ্টার টেবিলের ওপর বোতল-টোতল নামাতে লাগল। ঠোঁটে ভাঙা ভাঙা শিস।

সুরপতি আমবাগানের ছায়া থেকে নিমেষে গ্রীণ পার্কে চলে এল। দুপুরেব আলো. শুকনো আমপাতার গন্ধ, বৈশাখের সেই তপ্ত বাতাস—কোথাও কিছু নেই। তবু সুরপতি বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন অনুভব করল, সিনেমার মেশানো ছবির মতন আমবাগানেব অস্পষ্ট দৃশ্য প্রমথর পেছনে ক্রমশই মিলিয়ে যাচ্ছে।

"মীরা লজ্জা পাচ্ছিল," প্রমথ বলল, "বাঙালী মেয়েদের এই লজ্জা-ফজ্জা আর যাবে না। এক বোতল সোডা আর জলটল দিয়ে যাবে তাতে লজ্জাবতী হয়ে গেল। তোকেই লজ্জা। আমাকে তো সবই এগিয়ে দেয়।"

-প্রমথ আবার সেই একই ঢঙে শিস দিতে দিতে চলে গেল।

সুরপতি হুইস্কির বোতল, দুটো গ্লাস অন্যমনস্কভাবে দেখল। কোনো উৎসাহ বোধ করল না। মীরা কোথায়? রান্নাঘরে? নাকি অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে আছে? প্রমথকে কি কিছু এগিয়ে দিচ্ছে?

ব্যারাকপুরের বাড়ির কথা মনে পড়ল সুরপতির। দরজায় তালা ঝুলছে। তারামণির বুড়ো বেড়ালটা উঠোনের এক কোণে বসে আছে হয়ত। গঙ্গার বাতাসে আধ-মরা বটগাছের দু'-চারটে পাতা ঝরে পড়ছে।

প্রমথ ফিরে এল। জলটল এনেছে। সোফায় বসতে বসতে বলল, "মীরা বলছে কি জানিস, তোকে পেয়ে আমি নাকি কাঁছা খোলা হয়ে গিয়েছি।" হাসতে লাগল, বলল আবার, "কাঁছাফাঁচা আমাদের বরাবরই খোলা। কি বল? তোর সেই রিলে রেসের কথা মনে আছে, সুরপতি? মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে আমরা শালা ওই ঠাণ্ডায় মাঘ মাসে, ল্যাংটা হয়ে রিলে রেস করেছিলাম। শিশিরের নিওমোনিয়া হয়ে যাবার জোগাড়।" কথার শেষে অট্টহাস্য হেসে উঠল প্রমথ।

সুরপতি মনে করবার চেষ্টা করল না। তবু অনেক দূরে—যেন গত জন্মের স্মৃতির মতন ঝাপসা কোনো দৃশ্য দেখল যেখানে চন্দ্রালোকে কয়েকজন নগ্ন যুবক দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এই জীবন কি তার ছিল? সুরপতি কি ছিল ওর মধ্যে?

প্রমথ হুইস্কি তৈরী করতে লাগল। "তোর অনারে আজ আমিও হুইস্কিতে থাকব। নো জীন। লোকে বলে জীনে, রেগুলার জীন চালালে ইমপোর্টেন্সি ডেভালাপ করে। দূর শালা—! আমার ও-সব ইয়েফিয়ে নেই।"

সুরপতি আচমকা বলল, "তুই রোজই খাস নাকি?"

"না। রোজ নয়। তবে মাঝে মাঝে।"

"অ্যালকোহলিক ফ্যাট লেগেছে তোর।"

"ছেড়ে দে।" প্রমথ সুরপতির গ্লাসে পুরোপুরি সোডা দিল না। কিছুটা জলও মিশিয়ে দিল। "তাহলে তুই শেষ পর্যন্ত বেনারসে গিয়ে ফেঁসে গেলি?"

সুরপতি চোখের ওপর আঙুল চেপে রাখল। কয়েক মুহূর্ত। হাত সরিয়ে বলল, "থেকে গেলাম। মেসোমশাই ছিল ডাক্তার। ডিসপেনসারী ছিল। মারা যাবার পর মাসিমা অন্য লোককে বসতে দিয়েছিল। পার্টনারশিপে দোকান শহুরে
ফেলেছে আমায় বসিয়ে দিল। ক্যাশে।"

সামান্য জায়গায়।"

আরাম না লাগত না," সুরপতি বলল, "পয়সা গুনে আমার কী হবে!"

চোখ দেখ।" প্রমথ সুরপতিকে গ্লাস এগিয়ে দিল। নিজেও নিল। হাত রাখে নি। তোর অনারে। আফটার সো মেনি লং ইয়ার্স তোকে ফিরে পেলাম

সুরপতি। ফিরে পেলাম কথাটা আমড়াগাছি নয়। রিয়েলি, আই মীন ইট্। চীয়ার্স!”

“চীয়ার্স।” সুরপতি হাত টেনে নিল। প্রমথ মনের দিক থেকে এখনও বিশেষ বদলায় নি যেন। সেই পুরোনো সরলতা থেকে গিয়েছে।

“বেনারসে আর কী করলি?” প্রমথ গ্লাসে চুমুক দিল।

“আমার দুই মাসতুতো বোন ছিল। রমা আর শ্যামা। ডাক নাম—বড়কি, ছুটকি। ছুটকিই আমায় বোলপুর থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বড়কি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করত, ছুটকি স্কুলে। ওরা আমায় একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিল।”

“সিগারেট নে।”

সুরপতির প্রথম চুমুকটা ছিল ছোট। এবার বড় করে চুমুক দিল। অনভ্যাসের জন্যে ভাল লাগল না।

“তাহলে বেনারসে ভালই ছিলি? ওখানে বিয়েটিয়ে করলি?”

মাথা নাড়ল সুরপতি।

“তবে করলি কী?”

“করলাম না। বড়কি, ছুটকিও বিয়ে করে নি। বোনরা কেউ বিয়ে করছে না. আমি কেমন করে করি,” সুরপতি হালকা করে বলল, যেন এই সহজ যুক্তিটা ছাড়া তার আর কিছু মুখে এল না। পরমুহূর্তে প্রমথর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু দ্রুত সুরপতি বলল, “মাসিমা মারা গেল। বাড়িতে আমরা তিনজন থাকতাম। বেনারসে আমার ধর—বছর ছয় সাত কেটে গেল। খুব একটা ভাল লাগছিল না। বেনারস ছেড়ে পালালাম। ঠিক কোথাও পার্মানেণ্টভাবে থাকি নি। পাটনায় বছর দুই ছিলাম, দেওঘরে থেকেছি আরও দু'-চার জায়গায়।”

“তুই বিয়েটিয়ে সত্যি সত্যি করিস নি? তখনও কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিলি?”

সুরপতি অন্যমনস্ক ছিল। আরও অন্যমনস্ক হল। প্রমথর দিকে তাকাল না। সিগারেটের ধোঁয়া সুতোর মতন সামনের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

“করেছিলাম,” সুরপতি আস্তে করে বলল।

“করেছিলি? তারপর?”

সুরপতি প্রমথর দিকে তাকাল। “আমার কথা শুনে তোর কোনো লাভ হবে না. প্রমথ। ভাল লাগার মতন কিছু নেই।”

প্রমথ বড় করে একটা চুমুক দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার। “হু কেয়ারস্ ফর ভাল লাগা? মন্দ লাগলেও লাগুক।”

মাথা নাড়ল সুরপতি। “না—; ও-সব কথা ছেড়ে দে। তুই ভাল মনে

রয়েছিস, আনন্দ পাচ্ছিস। কেন মুড্ নষ্ট করবি?"

প্রমথ সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রের মধ্যে ফেলে দিল। গন্ধ উঠতে লাগল পোড়া তামাকের। তারপর একেবারেই আচমকা রুক্ষ গলায় বলল, "তুই কী মনে করিস সুরপতি? আমি ঘাস খাই? আমার মাথায় গোবর পোরা? আনন্দ-টানন্দ আমি বুঝি। দুঃখও বুঝব না ভাবছিস?"

"কী দরকার! অন্তত আজকে!"

"তুই তা হলে জীবনটাকে নিয়ে দুঃখ করলি?"

"কিছু না--কিছু না," সুরপতি মাথা নাড়ল।

মীরার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। হাতে প্লেট। কিছু ভাজাভুজি এনেছে।

প্রমথ স্ত্রীর দিকে তাকাল। "আমার ফ্রেন্ডকে দেখো। আমি গলগল করে সব বলে যাচ্ছি—যা পেটে আছে উগরে দিচ্ছি। আর ও কিছু বলছে না। বলছে—ওর কথা শুনলে আমি দুঃখ পাব, মন খারাপ হবে।......মন খারাপ হয়, হবে। সো হোয়াট?"

মীরা একটু দাঁড়াল। তারপর কোমর নুইয়ে প্লেটটা রেখে দিল সেণ্টার টেবিলে।

সুরপতি এই প্রথম মীরার ডান হাতের তলার দিকে দীর্ঘ এক রেখা দেখল। মোটা, কালো—কোঁকড়ানো।

সুরপতি বলল, "ওই দাগটা কিসের?"

মীরা তাকাল। প্রথমে বুঝতে পারল না। পরে বুঝল। ঠাট্টার গলায় বলল, "আয়ু রেখা।"

সুরপতি ঠোঁট কামড়াল। সামান্য পরে বলল, "বোধ হয় পরমায়ু।"

তিন

রাত্রের খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর প্রমথ তাব বেচাল অবস্থাটা বুঝতে পারছিল। মাতলামি নয়, কিন্তু নেশার ঝোঁকে সে টেবিলের কাপড় নষ্ট করেছে, নিজের পাঞ্জাবিতে মাংসের দাগফাগ লাগিয়েছে—। গায়ের চাদরটাও যাচ্ছিল। অনর্গল কথা বলার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রমথ তার কথার খেই হারিয়ে ফেলছিল, হারিয়ে ফেলে গ্রামোফোনের ভাঙা রেকর্ডে পিন আটকে যাবার মতন একই কথা পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিল, হাসছিল, কখনো কখনো ছেলেমানুষের মতন টেবিল চাপড়াচ্ছিল। এ সবই তার বোধগম্য হবার পব প্রমথ আব দাঁড়াতে চাইল না। হুইস্কি জিনিসটা তার ভাল সয় না। কিংবা সইলেও সে সুরপতিকে পেয়ে একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিল। ঘুমও পাচ্ছিল প্রমথর। চোখ জুড়ে আসছিল, টাল লাগছিল। ঠোঁটেব সিগাবেটটা ফেলে দিয়ে প্রমথ বলল, সুবপতি, মীরা তোকে বিছানাটিছানা করে দিচ্ছে. আমি শুতে চললাম। দাঁড়াতে পারছি না।”

সুবপতি প্রমথর অবস্থাটা বুঝতে পারছিল। বলল, “তুই শুয়ে পড়।”

বসার ঘরেই বসে থাকল সুরপতি। মীবা টেবিল পরিষ্কার করছে। হয়তো আসতে একটু দেরিই হবে। সিগারেটটা ধীরে ধীবে খেতে লাগল সুরপতি।

এখন রাত কত অনুমান করা যায়। দশ, সোয়া দশ। এমন কিছু রাত নয়। শীতের শেষ, মানে কাছাকাছি কোথাও বসন্ত. বাতাসে ফিকে শীতের স্পর্শ থাকলেও এই কলকাতাব হাওয়ায় যেন কিছু এলোমেলো ভাব রয়েছে। ব্যারাকপুরের বাড়িতে, সুবপতির মনে হল, এখনও শীতের বাতাস আসছে গঙ্গার জলো ঝাপটা নিয়ে। সেখানে দশটা অনেক নিবিড় রাত। তারামণি তাব ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে, যদি না ঘুমিয়ে থাকে—কবিরাজী তেল আর জল মাথার চাঁদিতে মেখে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। হরিপদ তার দোকানের ঝাঁপ ফেলেছে, ফেলে মাঠকোটার দোতলায় তাব বউকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশায় মত্ত। হরিপদর বউ ছেলেমানুষ, বছর বিশেকও বয়েস হয় নি, স্বাস্থ্য চমৎকার, খাটিয়ে মেয়ে। মানভূমের মেয়ে বলে তার কথায় নানা রকম টান আছে, বিচিত্র বিচিত্র শব্দ বলে ফেলে। হরিপদ বারাসতের লোক, বউয়ের কথায় মজা পায়, রগড় করে, মস্করা চালায়। ওরই অন্যদিকে উমাশশীর ভাঙাচোরা একতলা ঘর। ছেলে বাবলু। বাবলু নাকি বছর পাঁচেক আগে তলপেটে ছুরি খেয়েছিল। ধাক্কাটা

সামলে নিলেও তার শরীর ভেঙে গিয়েছে; রোগাটে চেহারা, চোখ দুটো জণ্ডিস রোগীর মতন হলুদ, গায়ের চামড়াও খসখসে খড়িওঠা। বাবলু মার তাড়নায় ইলেকট্রিকের এক দোকান দিয়েছে, দেড় হাতি দোকান, খদ্দেরটদ্দের বড় পায় না।

সুরপতি নিজের ঘরের কথা ভাববার চেষ্টা করল। অন্ধকার। জানলা-গুলোও বন্ধ। বাসী বিছানা পড়ে আছে। জলের কুঁজোটাও সকালে ভরা হয় নি। চায়ের তলানিতে কাপে রঙ ধরে গেছে।

এমন সময় সুরপতি পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখল মীরা এসেছে।

প্রমথর জন্যে মীরা বোধ হয় একটু বিরক্ত ছিল। তার চোখেমুখে সন্ধ্যের সেই স্বাভাবিক প্রসন্নতা লক্ষ করা যাচ্ছিল না। চোখ দুটি অন্যমনস্ক, ঈষৎ রুক্ষ। তবু মীরা স্বাভাবিক হবার ভাব করছিল। "আপনার বিছানা করে দিয়েছি।"

সুরপতি মীরার চোখ দেখছিল। বলল, "আমার তাড়া ছিল না। আপনি খেয়েছেন?"

মাথা নাড়ল মীরা।

"আপনি খাওয়াদাওয়া সেরে আসুন। আমি বসে আছি।"

মীরা অস্বস্তির চোখ করে তাকিয়ে থাকল। "রাত হয়ে গিয়েছে।"

"সাড়ে দশটশ।...আপনি আসুন, আমি বসে আছি।"

"বসে থাকবেন? বিছানা কিন্তু তৈরি।"

সুরপতির মনে হল, বসার ঘর থেকে সে না ওঠা পর্যন্ত মীরা স্বস্তি পাবে না। কিংবা মীরা কি ভাবছে, সুরপতির এই স্বাভাবিকতা কৃত্রিম? প্রমথর মতন বিছানায় যাওয়াই তার উচিত? মীরার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? সুর-পতি বলল, "বেশ চলুন।"

প্রমথর এই ফ্ল্যাটটা ভাল। বাড়িও পুরনো নয়। ছোটর মধ্যে ব্যবস্থা প্রায় সবই আছে। ভেতরে মোটামুটি চওড়া করিডোরের বাঁ দিকে প্রমথদের শোবার ঘর, বাথরুম। করিডোরের মুখোমুখি রান্নাঘর আর স্টোর রুম। ডান দিকের প্যাসেজটা সরু. প্যাসেজের মুখেই আর-একটা ঘর. বাড়তি প্যাসেজটুকু ছোট ব্যালকনির মতন পড়ে আছে।

সুরপতি ঘরে এল। বাতি জ্বালানো। সরু খাট একপাশে, যৎসামান্য কিছু আসবাব—যেমন পুরোনো একটা দেরাজ, গোল মতন টেবিল, বেতের চেয়ার, পায়ে চালানো সেলাই কল। অন্য কিছু টুকিটাকি পড়ে আছে কোণঘেঁষে।

সুরপতি বলল, "আমি দেরি করে ঘুমোই। আপনি খেয়ে আসুন, আমি বসে আছি।"

মীরা বিছানার দিকে তাকাল। ধোয়ানো চাদর পেতে বিছানা করে দিয়েছে, বালিশের ওয়াড়ও পরিষ্কার। পায়ের তলায় কম্বল আর নেটের মাশারি রাখা আছে। মীরা মশারি টাঙিয়ে দিয়ে যেতে পারত। ভেবেছিল টাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

বাধ্য হয়েই যেন মীরা চলে গেল।

সুরপতি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য, তারপর দু চার পা হাঁটল, পায়চারির মতন। দেওয়ালে প্রমথর মেয়ের ছবি। ছিপছিপে গড়ন, চোখা চোখা নাক চোখ, মেয়েলী প্যান্ট শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে টেবিল টেনিসের র‍্যাকেট। প্রমথর কোনো ছাপ মেয়েটির চেহারায় নেই, মীরার সামান্য আছে। সুরপতি একটু লক্ষ করে দেখল। প্রমথর মেয়েকে বেশ ঝরঝরে তরতরে মনে হচ্ছে। আর-একটা ফটো অন্য দেওয়ালে। প্রমথর ছেলের নয়। মীরারও নয়। এক মহিলার। আটপৌরে বাঙালী প্রবীণার। প্রমথর মার হতে পারে। বিধবার বেশ। মুখটি অনেক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। বেশ পুরোনো ছবি। যদি প্রমথর মার হয়—তবে দু দেওয়ালে ঝোলানো ঠাকুমা এবং নাতনীর মধ্যে যে বিস্তর এক ব্যবধান থেকে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। ফটো তোলার দোকানে হরেক রকম ফটো টাঙিয়ে রাখা হয়, পাশাপাশি, ওপরে নীচে; অত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও বোঝা যায় একের সংগে অন্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সুরপতির মনে হল, প্রমথর মা এবং মেয়ের মধ্যেও কোনো সম্পর্ক নেই। এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যবধান সেটা কোনো মতেই ঘোচানো যায় না। স্কুল মাস্টারের বিধবা স্ত্রী আর দারজিলিঙে পড়া প্রমথর মেয়ে দু প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

গোল টেবিলের ওপর দু চারটে ইংরেজী সিনেমার ছবির কাগজ, ফ্যাশানের কাগজ, কমিকস পড়ে ছিল। একটা পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া পাখির রঙিন ছবি।

বিছানায় এসে বসল সুরপতি। ঘরের জানলা বন্ধ। এদিকে বেশ মশা। দু চারটে মশা হাতে পায়ে বসছিল।

তারামণি সুরপতির জন্যে রুটিটুটি করে রেখে দেয়। সাধারণ কোনো তরকারি। দুধটাও ফুটিয়ে রাখে। মাছ মাংস রাঁধতে চায় না, পারেও না। নিতান্ত অরুচি ঠেকলে সুরপতিকে বাজারের হোটেল থেকে মাংসটাংস কিনে নিয়ে যেতে হয়। ইচ্ছে করে না সুরপতির। তার পেট ভরানোর ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহও নেই। আজ তারামণির রান্না নষ্ট হল। কাল বুড়ি খচখচ করবে।

প্রমথর আজকের এই সমাদর যে অকৃত্রিম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কখনো কখনো—অন্তত প্রথমে সুরপতির মনে হয়েছিল, উচ্ছ্বাসের ঝোঁকটা কেটে গেলে প্রমথ মিইয়ে পড়বে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তখন ভদ্রতা এবং সৌজন্যের বেশী কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রমথর উচ্ছ্বাস কাটল না। বরং নেশার

ঝোঁকে সেই উচ্ছ্বাস আরও বেড়ে উঠল। অবশ্য একে শুধুই উচ্ছ্বাস বলা ঠিক নয়, আন্তরিক আকর্ষণও বলা উচিত। হৃদয়ের এই তাপ প্রমথ এখনও রেখেছে।

শুধুই কি তাপ রেখেছে প্রমথ? সুরপতি এখানে কিছুটা সন্দিগ্ধ। প্রমথকে কি তাপিত মনে হয় না? কখনো কখনো, কোনো কোনো কথায় প্রমথকে তাই মনে হচ্ছিল।

সুরপতি অন্যমনস্ক হল। বিছানার সাদা নরম চাদরের ওপর ডান হাতটা আস্তে আস্তে ঘষতে লাগল। যেন কিছু কোমলতা মসৃণতার স্পর্শ পেতে চাইছিল। আনমনা দৃষ্টিতে মশারির দিকে তাকাল। পাট করা মশারি পড়ে আছে।

শ্যামার অভ্যেস ছিল সুরপতির পাতা বিছানার চাদর তুলে বালিশ সরিয়ে আবার সব পরিষ্কার করে পেতে দেওয়া। বিছানা পাতা হয়ে গেলে শ্যামা কয়েক ফোঁটা ওডিকোলন বালিশে চাদরে ছড়িয়ে দিত। বলত, ভাল ঘুম হয়।

সুরপতির ভাল ঘুম হত না। গন্ধটা তাকে, তার স্নায়ু এবং চেতনাকে কাতর করে রাখত। বালিশ উলটে নিত সুরপতি। গন্ধটাকে যেন তলায় চেপে রাখার চেষ্টা করত। তলা থেকে আরও ভীষণ এক কাতরতা ওপরে উঠে আসত। গ্রাস করত। বালিশ উলটে নিলেই কি ইন্দ্রিয়ানুভূতি চাপা যায়!

মীরা এসেছিল। সুরপতি যখন তাকাল, মীরা তখন গোল টেবিলটার দিকে।

"আমার জন্যে তাড়াহুড়ো করলেন না তো?" সুরপতির মুখের অন্য-মনস্ক ভাবটা কেটে গেল।

"না, না।"

সুরপতি মীরার মুখ দেখছিল। স্বামীর জন্যে যে বিরক্তি ময়লার মতন মীরার চোখেমুখে তখন জমেছিল এখন তা আছে বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো মীরা সযত্নে তা সরিয়ে ফেলেছে।

"আপনি বসুন না", সুরপতি বলল।

মীরা বসব মনে করে আসে নি বোধ হয়, সুরপতির অনুরোধে কিছুটা অবাক হল, ইতস্তত করল।

"এগারোটা বাজে--", মীরা সাধারণভাবে আপত্তি জানাবার চেষ্টা করল।

"আপনার অনেক পরিশ্রম গেল", সুরপতি বলল, "ক্লান্ত বোধ করছেন।"

"না না", মীরা বলল, "পরিশ্রমের কী—!" বলতে বলতে যেন তার পরিশ্রম হয় নি—সে ক্লান্ত নয়, সুরপতির অনুরোধ মতন বেতের চেয়ারটায় বসল।

বেতের চেয়ারটা সাধারণ, হাতল রয়েছে। চেয়ারের ওপর তুলোর গদি।

সুরপতি দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "প্রমথ ঘুমিয়ে পড়েছে?"

মীরা একদিকে মাথা হেলাল। প্রমথর কথা ওঠায় সামান্য গম্ভীর হল।

সুরপতি বলল, "প্রমথ এখনও মাঝে মাঝে ছেলেমানুষি করে ফেলে। ওকে দেখে এই ক'ঘন্টায় আমার তাই মনে হচ্ছে। আমায় দেখে ও এত হই-হললা করবে আমিও ভাবি নি। আজকের ব্যাপারটায় আপনি ওকে মাফ করে দিন, আমার খাতিরে অন্তত।"

সুরপতির কথা বলার মধ্যে যে নরম, সরস অথচ ক্ষমা প্রার্থনার ভাব ছিল —মীবা তা কানে ধরতে পারল। পেরে সংকুচিত হল। বলল, "আমি কিছু মনে করি নি।"

"করলেও আর মনে রাখবেন না।"

"ও বড় একটা এরকম করে না।"

সুরপতি লক্ষ করল, মীরা আবার পা নাড়াচ্ছে, হাঁটু দুটো কাঁপছে. শাড়িও। শ্যামাও পা কাঁপাত, পায়ের সঙ্গে তার গা কেঁপে উঠত, বা সে কাঁপাত।

"এটা আমার মেয়ের ঘর", মীরা বলল, তাকাল চারপাশে, "ছুটিতে এলে থাকে।"

"ছবি দেখলাম", সুরপতি মৃদু হাসল, "খেলাধুলো করে বুঝি?"

"ওই।...শীতের ছুটিতে এসেছিল রুমকি। এই তো গেল সবে।"

"কত বয়েস হল?"

"বারো—।"

"একলা থাকতে পারে?"

"বেশ পারে। আমার জামাইবাবু রয়েছেন ওখানে।"

সুরপতি রুমকির কথায় আর গেল না। বলল, "ছেলে তো এখানে থাকে না।"

"না", মাথা নাড়ল মীরা, "আমার মার কাছে থাকে। ওকে ছাড়া মা থাকতে পারে না, ওরও সেই অবস্থা। বড় আদুরে হয়ে উঠেছে।"

সুরপতি হাসল। "এভাবে থাকতে আপনাদের খারাপ লাগে না?"

মীরা পা দুটো জোড়া করে ফেলল। হাঁটুতে হাঁটুতে জুড়ে গেল যেন। পাতলা একটা সুতীর চাদর গায়ে নিয়েছে মীরা। সুরপতির চোখে চোখে তাকাল। "খারাপ তো লাগেই। লাগলেও উপায় কি!"

সুরপতি মীরার মধ্যে কেমন এক দ্বিধা লক্ষ করল। যেন খারাপ লাগাটা তেমন কিছু নয়, মীরা খারাপ লাগা সহ্য করতে পারে। কাছে রাখতেই ভয় হয়।

মীরাই কথা বলল। "আপনার মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে যাই।"

সুরপতি তাকাল। "আমি টাঙিয়ে নেব।"

"না না, সে কি! আমি দিচ্ছি।"

"কোনো দরকার নেই। আমি পারি। অভ্যেস আছে।"

মীরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মশারি টাঙাবার জন্যেই যেন এগিয়ে আসছিল। সুরপতির কথায় দাঁড়িয়ে থাকল। কি বলবে না-বলবে বুঝতে পারছিল না। সামান্য দাঁড়িয়ে আবার দু পা এগিয়ে বিছানার পায়ের দিকে চলে গেল। বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে যতটা পরিহাস যোগ্য হবে তার পক্ষে তার মাত্রা রেখেই তরল গলায় বলল, "আপনি পারেন বেশ করেন। এখানে আপনার পারতে হবে না। এটা মেয়েদের কাজ, তা ছাড়া আপনি আমাদের অতিথি।"

সুরপতি বিছানায় বসে বসেই দেখল মীরা খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে মশারি তুলে নিচ্ছে। লম্বা ফরসা হাত সাদা মশারির ওপর পড়ল।

"আপনার হাতের ওই দাগটা কিসের?" সুরপতি আচমকা প্রশ্ন করল।

মীরা মশারি ওঠাতে গিয়েও থমকে গেল। সুরপতির চোখে চোখে তাকাল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকল যেন, তারপর যখন নিঃশ্বাস ফেলল, আচমকা শ্বাস ফেলার শব্দ হল। "বললাম না, আয়ুরেখা।"

সুরপতি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। "কেটে গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ" মীরা মশারি উঠিয়ে নিল। "কাচে।"

"অনেকটা কেটেছিল", সুরপতি উঠে দাঁড়াল, "আর-একটু হলেই বুড়ো আঙুল চলে যেত, তাই না?"

মীরা বিছানার ওপর মশারি ফেলে দিয়ে একটা আগা নিয়ে জানলার দিকে চলে গেল। যাবার সময় বিভ্রমের চোখে যেন দেখল সুরপতিকে। চোখ নামাল। মশারির কোণায় ফিতে বাঁধা ছিল। জানলার মাথায় হুক পোঁতা রয়েছে।

সুরপতি মীরাকে পেছন থেকে দেখছিল। পুরোপুরি পেছন নয়, পাশ থেকেও। মীরার গায়ের চাদর, শাড়ির আঁচল তার কোমরের ভাঁজ কিছুটা ঢেকে রাখলেও সবটা ঢাকতে পারে নি। মীরাকে দু' পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হতে হয়েছিল, ফলে তার বাঁকা শরীরের জন্যে কোমরের ভাঁজ আরও গভীর দেখাল; আলোর একটা অস্পষ্ট ছায়া তার তলায়। যেন সরীসৃপের মতন কিছু একটা ক্রমশই নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

"হাতটাই হাঁ হয়ে গিয়েছিল", মীরা ঘুরে দাঁড়াল। একটা খুঁট বাঁধা হয়েছে। দ্বিতীয় খুঁটের জন্যে বিছানার দিকে এগিয়ে আসছিল। পায়ের হালকা চটিতে শব্দ। "পাঁচ ছটা স্টিচ দিতে হল হাসপাতালে। রক্তে ভাসা-ভাসি। ওষুধ, ইনজেকশন—" মীরা বিছানার কাছে এসে দ্বিতীয় খুঁটটা তুলে নিল। "আপনার চোখ সবই দেখতে পায়।" মীরা হাসল।

সুরপতি হাসল না। বলল, "চোখে পড়ার মতন হয়ে রয়েছে।"

"আমি তখন ভেবেছিলুম আপনি হাত দেখতে পারেন।"

"বেশ ভেবেছিলেন।"

"বা, আমার দোষ কি! আপনি কাশীতে থাকতেন।"

"কাশীতে থাকলে লোকে জ্যোতিষ হয়?"

"কি জানি! শুনেছি চর্চা হয় জ্যোতিষের, কাশীতে। লোকে বলে।" মীরা দ্বিতীয় খুঁটটা নিয়ে দেওয়ালের দিকে চলে গেল।

সুরপতির শ্যামাকে মনে পড়ল। মীরা শ্যামার চেয়ে মাথায় খাটো। শ্যামা ছিল মাথায় লম্বা, হাতও লম্বা লম্বা ছিল। মশারি টাঙাবার সময় সে অক্লেশে সব জায়গায় হাত পেত, হাত না পেলে সুরপতিকে কাঠের চেয়ারটা টেনে দিতে বলত।

"আপনি আমায় দিলে পারতেন", সুরপতি বলল।

মীরা যতটা সম্ভব গোড়ালি উঁচু করেও নাগাল পাচ্ছিল না। তাব গায়ের চাদর খুলে যাচ্ছিল।

সুরপতি উঠে গিয়ে মীরার পেছনে দাঁড়াল। মীরা তখনও একেবারে হাল ছেড়ে দেয় নি। ছোট করে লাফ মেরে ফিতের ফাঁসটা দেওয়ালের হুকে লাগিযে দেবাব চেষ্টা করছিল। সুরপতি তার লাফ দেখল। একটা অদৃশ্য ঢেউ যেন সুরপতিব ইন্দ্রিয়ে এসে ঘা দিল।

মীরা পারল না। অনুভব করল সুরপতি তার পেছনে। ঘুরে দাঁড়াল। তাবপর হেসে ফেলল।

"দিন।" সুরপতি ফিতেটা নিল। হুকে আঁটকে দিল।

"আমি বেঁটে মানুষ—" মীরা নিজেকেই নিজে ঠাট্টা করল। "এ ঘবে একটা ছোট মোড়া ছিল—তার ওপর উঠে টাঙিয়ে দিতাম। আপনাব বন্ধু সেটা ভেঙেছে। ভেঙে ফেলে দিয়েছে।"

"আপনি ঠিকঠিক লম্বা", সুরপতি বলল, "মেযেবা এই বকমই হয়। আরও লম্বা কমই হয়।"

মশাবির একটা পাশ বিছানা এবং বিছানার বাইরে ঝুলছিল। মীরা হাত দিয়ে মশারি ঠেলে অন্য পাশে এল। সুরপতিও।

সুরপতিই বাকি দু' দিকের ফাঁস দেওয়ালের হুকে লাগাতে লাগল। মীবা মশারি গুঁজে দিচ্ছিল।

মীরা বলল, "রাত্রে আপনার আর কিছু দরকার লাগবে? কম্বল পায়ের তলায় রয়েছে।"

"আমার জামাটা কি এ-ঘরে?"

"না। ও-ঘরেই পড়ে আছে। এনে দিচ্ছি। জল রাখব?"

মাথা নাড়ল সুরপতি।

মীরা চলে গেল। সুরপতি কয়েক পলক বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকল।

পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি সাদা বিছানা। আচমকা তার মনে হল, খানিকটা বড় মাপের মোটা কাচের বাক্সর মতন দেখাচ্ছে বিছানাটা। সুরপতি আর সামান্য পরে ওই বাক্সের মধ্যে শুয়ে থাকবে, চোখ বন্ধ করে। মানুষের নিদ্রা এবং মৃত্যুর ধরনটা প্রায় একই। শ্যামা কখনো বিছানায় সাদা চাদর পেতে দিত না, রঙীন ছাপানো চাদর সে পছন্দ করত, বালিশের ওয়াড়ও ছিল নকশা করা। বলত, সাদা রঙটা হাসপাতালের, বাড়িতে সাদা থাকবে কেন? শ্যামা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলত: বিছানা সাদা রাখলেই পরিষ্কার থাকে নাকি? সাদা বিছানাও নোঙরা হয়। কী হয় না? সাদা মানে শুদ্ধ নয়।

মানুষের বাইরেটা শ্যামা কোনো কালেই গ্রাহ্য করত না। বড়কি—মানে রমা বাইরেটা গ্রাহ্য করত। দুই বোনের মধ্যে অমিলটা ছিল এইখানে, চোখে পড়ার মতন। রমা সুরপতিকে পছন্দ করলেও কখনো তার ভেতরটা সুরপতিকে বুঝতে দেয় নি। শ্যামা দিয়েছিল। যখন রমার চামড়ার এক অদ্ভুত অসুখ করল—তার মোটামুটি ফরসা রঙ নীল হয়ে আসতে লাগল, হাত গলা পিঠ বুকের, তখন রমা তার শরীর ঢেকে রাখার জন্যে এত ব্যস্ত ও সতর্ক থাকত যে, জামাকাপড়ের মধ্যে দিয়ে তাকে আর দেখাই যেত না। শ্যামা এ-সব ব্যাপারে অসংকোচ ছিল।

মীরা ফিরে এল। জল এনেছে। সুরপতির জামা-টামাও। জল রেখে মীরা জামা প্যান্ট চেয়ারের ওপর রাখল।

"আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি যাই", মীরা বলল।

"হ্যাঁ, আসুন। রাত হয়ে গিয়েছে।"

চলে যাচ্ছিল মীরা। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হঠাৎ, ঘুরে তাকাল। কিছু বলতে গিয়েও দু মুহূর্ত চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "সকালে ডাকব? না, ডাকব না?"

সুরপতি মীরার চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করল। শেষে বলল, "যদি ঘুমিয়ে থাকি ডাকবেন। বোধ হয় জেগেই থাকব।"

মীরা কথা বলল না। চলে গেল।

সুরপতি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সুইচের শব্দ হল যেন, করিডোরের আলো নিবল, দরজার মুখ পর্যন্ত অন্ধকার এসেছে। রাত হয়ে আসার নীরবতা অনুভব করা যাচ্ছিল, ভাঙাচোরা অস্পষ্ট কিছু শব্দ রয়েছে গলিতে। ঘরে-ফিরে-যাওয়া রিকশাওয়ালার গাড়ি টানার শব্দ, কোনো ট্যাক্সির গলিতে এসে হঠাৎ থেকে যাওয়া। মীরাদের ঘরের দিক থেকে আরও অন্ধকার নেমে এল। নিজের ঘরে ঢুকে গেল বোধ হয় মীরা।

সুরপতি ঘরের দরজা বন্ধ করল না। ভেজিয়ে দিল। বাতি নেবালো।

বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল সুরপতি। কম্বলটা নরম।

গায়ে রাখতে ভালই লাগছিল। প্রমথকে বা মীরাকে এ-সময় কল্পনা করতে সুবপতির মন্দ লাগল না। প্রমথ তার গোলগাল চেহারা নিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মীরা স্বামীর পাশে শুয়ে আছে। হয়ত তফাৎ রেখেই।

অনেক কাল আগে সুরপতি যখন রাঁচির দিকে কেশবজীর সঙ্গে কাঠের কারবার করে বেড়াচ্ছে, তখন একদিন সে বিকেলে বৃষ্টি বাদলার জন্যে গ্রামের এক চেন বাড়িতে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিল। একটি মাত্র মাটির ঘর। বাইরে উঁচু দাওয়া। একপাশে কাটা কাঠের স্তূপ। দড়ির ছোট খাটিয়ায় সুরপতি শুয়ে ছিল, ঘুম আসছিল না। বৃষ্টি-বাদলা কেটে গেছে। ঘুটঘুটে রাত। চারদিকে জংগল আর ভিজে বাতাস অন্ধকার যেন মাখামাখি হয়ে এক বিশাল বন্যার মতন সমস্ত ঢেকে ফেলেছিল। সুরপতি একবার বাইরে গিয়েছিল—ফেরবার সময় চোখে পড়ল, হাকিমেব যুবতী বউ কাঁচা কাঠের স্তূপের আড়ালে দাওয়া ঘেঁষে বসে। হাকিম খড়ের ওপর চট আর কাঁথা পেতে শুয়ে। হাকিমেব বউ তার বরেব পাশে বসে কাপড় খুলে আঁচলে ধরে আনা জোনাকি ঝেড়ে দিচ্ছে। নীলাভ আলোর বিন্দু দু' জনের চাবপাশে জ্বলছিল, নিবছিল। হাকিমের বউ দেহাতী গলায় হাসছিল। হেসে হেসে হাকিমেব গায়ে মিশে যাচ্ছিল।

সুরপতি ও-রকম দৃশ্য দেখে নি কখনো। সে মুগ্ধ, অভিভূত, অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর ঘরে ফিরে এসে শুয়ে শুয়ে ভেবেছিল, ওই জোনাকিগুলো তার আর হাকিম দম্পতির মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে তা জন্মান্তরের।

মীরা আর প্রমথকে অতটা দূরের মনে হয় না কেন?

মীরা আর প্রমথ গদিঅলা বিছানায় শুয়ে থাকে, পাশাপাশি। তারা অনেককাল ওইভাবে শুয়ে আছে, আরও দীর্ঘকাল থাকবে; কিন্তু সুবপতি বুঝতে পেরেছে—ওই শয্যা নিবিড় নয়।

প্রমথর জন্যে সুরপতি দুঃখ বোধ করছিল।

চার

সকালে চা খেতে বসে প্রমথ স্ত্রীকে বলল, "সুরপতি এখনও ঘুমোচ্ছে "

মীরা চা ঢেলে দিচ্ছিল। শোবার ঘরের গায়ে চওড়া করিডোরের একপাশে খাবার টেবিল। পুবের রোদ এদিকে আসে না। দুপুরের দিকে মাপাজোপা রোদ এসে বড় জানলা ছুঁয়ে কাচ তাতিয়ে চলে যায়।

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে মীরা বলল, "দেখছি না।"

প্রমথ অবাক হল। বিছানা ছেড়ে সোজা বাথরুম, বাথরুম থেকে বেরিয়ে চায়ের টেবিলে এসে বসেছে। চোখের তলায় এখনও ঘুমের চিহ্ন ফুটে আছে, পাতা দুটো ফোলা ফোলা, মুখ সামান্য ভারি, মাথার চুল উসকোখুসকো।

চায়ের সঙ্গে টোস্ট এগিয়ে দিল মীরা। বলল, "কোথাও বেরিয়েছেন বোধ হয়।"

প্রমথ অবাক হয়েই বলল, "তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?"

মীরা তার নিজের কাপ মুখের কাছে টেনে নিল। বলল, "না। সকালে আমি রাধাকে দরজা খুলে দিতে উঠেছিলাম, তখন ও-ঘরের দরজা বন্ধ ছিল দেখেছি। রাধাকে দরজা খুলে দিয়ে আবার আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছি।"

"রাধাও দেখেনি?"

"ও কি করে দেখবে? রান্নাঘর পরিষ্কার করে দুধ আনতে গেল। আজ আবার দুধের গাড়ি আসতে দেরী করেছে। রাধা ফিরে আসার পর আমি উঠেছি।"

প্রমথ বিরক্ত হল। মীরা ঘুম থেকে উঠে কোন্ কোন্ কর্তব্য সেরেছে তা জানার কোনো আগ্রহ সে বোধ করল না। বুঝতে পারল, সুরপতি কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে মীরা খেয়াল করেনি।

টোস্ট নিল না প্রমথ। বিরক্ত গম্ভীর মুখ করে চায়ে চুমুক দিল।

"ও কি নিজের জামাটামা পরে বেরিয়েছে?" জিজ্ঞেস করল প্রমথ।

"হ্যাঁ।"

চুপ করে থাকল প্রমথ। আশ্চর্য, কোথায় গেল সুরপতি? সাত সকালে কাউকে কিছু না বলে, চা-টুকু পর্যন্ত না খেয়ে কোথায় চলে গেল? কাছাকাছি কোথাও ঘুরতে গিয়েছে? আশেপাশে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে? মর্নিং

ওয়াক করছে নাকি? কিংবা মীরা দেরী করে উঠেছে দেখে সুরপতি চুপ-চাপ সকালে বসে না থেকে বাইরে খানিকটা ঘুরে-ফিরে আসতে গিয়েছে?

"তোমায় কাল কিছু বলেছিল?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"আমায়? কখন?"

"আমি শুতে চলে গেলাম। তারপর তোমায় কিছু বলেছিল?"

"না।"

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল প্রথম কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, "স্ট্রেঞ্জ!"

মীরাও গম্ভীর। অপ্রসন্নই মনে হচ্ছিল। সুরপতি না-থাকাব জবাব-দিহি তাকে করতে হবে কেন?

প্রমথর সকালের দিকে এলার্জির মতন হয়, নাকের ভেতরে সর্দি সর্দি ভাব হয়। চুলকোয়, হাঁচি পায়। শীত আর বর্ষায় এটা লেগেই থাকে। দু-চারবার হাঁপানির মতন শ্বাসের কষ্টও হয়েছে। নাক চুলকোচ্ছিল বলে প্রমথ বুড়ো আঙুলে নাক ঘষতে লাগল।

মীরা চায়ে আরও একটু দুধ মিশিয়ে নিল। কড়া লাগছিল। প্রমথর দিকে তাকাল। "শুধু চা খাচ্ছ কেন?"

প্রমথ হাঁচি সামলাতে পারল না। বার চারেক হাঁচল। গলায় অল্প সর্দি গিয়ে জমেছে। জড়ানো স্বরে প্রমথ বলল, "বুঝতে পারছি না, ও চলে গেল নাকি?"

মীরা এক টুকরো টোস্ট খেতে খেতে বলল, "কিছু না বলেই চলে যাবে?"

প্রমথ নিজেও নিশ্চিন্ত নয়, সন্দেহের গলায় বলল, "কি জানি! যাওয়া উচিত নয়। ...তবে ওর কথা বলা যায় না, যেতেও পারে।"

মীরা আর কথা বাড়াল না।

প্রমথ টোস্ট নিল। পুবের দিকে তাকাল অন্যমনস্ক চোখে। একেবারে শেষ প্রান্তে দেওয়াল ঘেঁষে উঁচু টুলের ওপর ক্যাকটাসের টব, মাটিতে পোড়া ইটের চৌকোণো টবের মধ্যে পাতাবাহার, দেওয়ালে একটা বাহারী কাঠের ফ্রেমে আয়না ঝুলোনো, ঝন্টু তার বিকল এয়ারগানের গলায় ফাঁস বেঁধে এক কোণে পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে। জুতোটুতো, সংসারের খুচরো কিছু কাজের জিনিস সবই দেওয়াল ঘেঁষে রাখা রয়েছে। দক্ষিণ ঘেঁষে উঁচুতে জানলা। আলো আসছে। এদিকে টেবিল ছুঁয়ে ফ্রিজ।

"কাগজটা কই?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"চা খাও; এনে দিচ্ছি।"

প্রমথ চুপ করে থাকল।

মীরাই শেষে বলল, "রুমুকে আজ চিঠি লিখবে না?"

প্রমথ যেন কথাটা শুনতে পায়নি। তাকিয়ে থাকল ফাঁকা চোখে। তার-পর বলল, "আজ অফিসে গিয়ে লিখব।"

"আমি সেদিন লিখেছি। রুমু তার অ্যালবাম ফেলে গেছে, লিখে দিও।"

প্রমথ হঠাৎ উঠে পড়ল। শোবার ঘরে চলে গেল। ফিরে এল আবার। সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার এনে টেবিলে রাখল। "তোমার মার কাছে কবে যাচ্ছ?"

"শনিবার যাব ভাবছি।"

"আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"মৃদুল ধরে নিয়ে যাবে। ওর বাবা ফিরে আসছেন।"

"সেরে গেছেন?"

"তাই বলছিল। ভেলোরে ভাল অপারেশান হয়েছে। সঙ্গে মৃদুলের বড় মামা থাকবে।"

মীরার চা খাওয়া শেষ হল। উঠে পড়ল সে।

প্রমথ সিগারেট ধরাল। সুরপতি কোথায় গেল? কিছু না জানিয়ে হঠাৎ চলে গেল কেন? এ ধরনের অভদ্রতা করার মতন মানুষ সুরপতি নয়। কোনো জরুরী কাজের কথা মনে পড়েছিল নাকি, সাত সকালেই উঠে চলে গেল! প্রমথ সুরপতির ঠিকানা জানে না, কোথায় থাকে ব্যারাকপুরে তাও নয়, কলকাতাতেও তার কোনো ঠিকানা নেই যেখানে খোঁজ নেওয়া যাবে। প্রমথর রাগই হচ্ছিল। সুরপতি বড় খারাপ কাজ করেছে। প্রমথ তাকে জোর করে ধরে আনল, বাড়িতে রাখল, আর যাবার সময় কিছু না জানিয়েই চলে গেল সুরপতি।

মীরা কাগজ এনে দিল।

"শোনো, একটা কথা ভাবছি", প্রমথ বলল।

দাঁড়িয়ে থাকল মীরা।

"কাল সুরপতি একবার বলছিল, তার বুকে ব্যথা হয়। হার্টের অসুখ-টসুখ আছে সামান্য। মাঝে মাঝে ওষুধ খায়। আমি ভাবছি, এমন তো হল না, সকালে এ দিকেই কোথাও ঘুরেটুরে বেড়াতে গিয়েছিল—হঠাৎ শরীর খারপ হয়েছে...?"

মীরা প্রথমটায় চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "হার্টের অসুখ বলছ, ওদিকে কাল বন্ধুকে আপ্যায়ন করতে ছাড়লে না তো?"

প্রমথ ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, "ও বেশ কম খেয়েছে। বলছিল, আজ-কাল ছেড়ে দিয়েছে—, খায় না। আমিই মাপ ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। হুইস্কি, স্পেশ্যালি এই দিশীটা আমার সুট করে না। আমার মনে হচ্ছে, এটা খেলে

আমার সকালে এলার্জিটাও বেড়ে যায়। নাক ভর্তি হয়ে গিয়েছে।"

মীরা আর দাঁড়াতে চাইছিল না। বেলা হয়ে যাচ্ছে। প্রমথ এখুনি দাড়ি কামাতে বসবে, স্নানে যাবে। কাজ পড়ে আছে অনেক মীরার।

"একবার দেখে আসব নাকি?" প্রমথ বলল, "পাড়ার মধ্যে?"

"তোমার অফিস নেই?"

"কী করা যায় বলো তো?"

"কিছু করতে হবে না। তোমার বন্ধু ছেলেমানুষ নয়। তার যদি কাণ্ড-জ্ঞান, ভদ্রতা, কর্তব্যবোধ না থাকে—তোমার অত ছটফট করবার কি আছে!" মীরা রূঢ় হয়ে বলল।

প্রমথ কোনো জবাব দিতে পারল না। স্ত্রীর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। সিগারেটের মুখে ছাই জমেছে অনেকটা, চায়ের কাপের মধ্যেই ঝেড়ে ফেলে দিল।

মীরা চলে গেল।

সুরপতির ওপর রাগ হলেও প্রমথ কেমন উৎকণ্ঠা বোধ করছিল। অনুচিত কাজ করেছে সুরপতি। মানুষের সঙ্গে খোলামেলা হয়ে মিশতে নেই। দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে নেওয়াও বোকামি। আজকাল, প্রমথ লক্ষ করে দেখেছে, বন্ধুবান্ধবরাও রাস্তার লোকের মতন ব্যবহার করে। কোনো শালাই মন থেকে আর বন্ধুত্বটন্ধুত্ব অনুভব করে না।

কাগজ খুলে প্রমথ অসন্তুষ্ট মনে প্রথম খবরটার দিকে চোখ দিল।

দুপুর বেলায় মীরা চুপ করে শুয়েছিল। চোখ বুজে, পাশ ফিরে। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলে চোখে তেমন আলো লাগে না। আল-মারি, ওয়ার্ডরোব আরও নানান আসবাবের আড়াল পড়ায় জানলার আলো দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। বিকেলের মতন ঘোলাটে, ঝাপসা হয়ে থাকে এ-পাশটা। মীরা যখন দুপুরে ঘুমোবার চেষ্টা করে কিংবা ঘুমের হালকা ঘোরের মধ্যে শুয়ে থাকতে চায়—তখন এইভাবেই পাশ ফিরে দেওয়াল-মুখো হয়ে শুয়ে থাকে, চোখ বুজে।

মীরা ঘুমোচ্ছিল না। তার চোখের পাতায় গাঢ় ঘুম নেই, অথচ তন্দ্রার মতন ফিকে ভাব রয়েছে ঘুমের। রাধা দুপুরের কাজকর্ম সেরে নীচে চলে গিয়েছে মীরা বুঝতে পারছিল। যতক্ষণ রাধা ছিল, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, করিডোর থেকে নানা রকম শব্দ আসছিল। এখন আর সে নেই। নীচে নৃপেনবাবুদের ফ্ল্যাটে রাধার ছোট বোন কাজ করে। ওখানে একফালি বাড়তি ঘর আছে। রাধার বোন থাকে। রাধাও। দুই বোনের ওটাই আস্তানা। মীরার পক্ষে এটা সুবিধের হয়েছে; হাতের কাছে ঝি; অথচ তাকে সর্বক্ষণের জন্যে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হয়নি।

মীরা তন্দ্রার মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল—রাধা নীচে যাচ্ছে। বাইরের ঘরের দরজায় গডরেজের দরজা-তালা, ব্যবস্থা করে বাইরে থেকে জোরে টেনে বন্ধ করলে নিজের থেকেই তালা লেগে যায়। শব্দটা শুনেছিল মীরা। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ উঠছিল না।

একেবারে নিরিবিলি বাড়ি। নিস্তব্ধ। প্রায় রোজই দুপুরে মীরা এই-ভাবে শুয়ে থাকে, কোনো কোনোদিন ঘুমিয়েও পড়ে। ঘুমিয়ে পড়লে কথা নেই, না ঘুমোলে ফাঁকা বাড়ি তার মনের তলায় আস্তে আস্তে যেন কোনো জাল ছড়িয়ে দেয়। মীরা যখন এ-বাড়িতে প্রথম আসে তখন পশ্চিমের দিকে একটা পুকুর ছিল। পুকুরে মাছ ছাড়া হত। মীরা দেখেছে, বড় জাল নিয়ে জেলেরা জলে নেমে জালটা জলের তলায় ছড়িয়ে দিত। তারপর যখন গুটিয়ে নিয়ে ডাঙায় উঠত, জলের মধ্যে ছোট ছোট মাছগুলো জ্যান্ত লাফাচ্ছে।

সেই পুকুর নেই। দেখতে দেখতে ভরতি হয়ে লাহাবাবুদের ফ্ল্যাট বাড়ি হয়েছে, দোকানপাট হয়েছে, সত্যেনডাক্তারের ডিসপেনসারি। ভালই হয়েছে। এই শহরে বাড়ির কাছে পুকুর. ঝোপঝাড়, খাটাল ঘুঁটে দেবার আয়োজন দেখলে কে না ভাববে—জায়গাটা পাড়াগাঁ। বাড়িতে কেউ এলে টেলে নাক সিঁটকোতো। ঠাট্টা করে বলত, 'শেয়াল ডাকে না রাত্তিরে?'

এখন এসব কিছুই নেই। চার পাঁচ বছরের মধ্যে এ-পাড়া শহুরে হয়ে উঠছে ষোলো আনা। দিন দিন আরও হচ্ছে, হু-হু করে নতুন বাড়ি উঠছে. গলির রাস্তায় পিচ পড়ছে, জলের পাইপ বসছে, লাইটের তার কতদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। মীরা এখন মাঝে মাঝেই স্বামীকে বলে—'তখন যদি খানিকটা জায়গা কিনে রাখতে!' জমি-জায়গার খোঁজখবরও আজকাল নিতে শুরু করেছে তারা।

অবশ্য, আজ দুপুরবেলায় শুয়ে শুয়ে এই পাড়া, ঘরবাড়ি কিংবা জমি কেনার কথা মীরা ভাবছিল না। তন্দ্রার মধ্যে সে অনুভব করছিল, মনের তলায় একটা জাল যেন ছড়ানো হয়ে গিয়েছিল কখন. এখন সেটা কেউ আস্তে আস্তে টেনে গুটিয়ে নিচ্ছে।

মীরা দেখেছে, সে যখনই কিছু ভাবে, মনে হয়—এক একটা ঘটনা, কোনো কোনো স্মৃতি মাথা উঁচিয়ে আছে। এই রকমই হয়, জীবনের পেছন দিকে ফিরে তাকালে খুঁটিগুলোই চোখে পড়ে, যেন মস্ত কোনো মাঠের ওপর দিয়ে টেলিগ্রাফের লাইন চলে গেছে, মীরা তাকিয়ে আছে. দূর দূর খুঁটি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না।

এ-রকম একটা খুঁটি তার দাদু। মানুষটাকে ভাল লাগে না, তবু মনে পড়ে। ভীষণ রাশভারী রুক্ষ ছিলেন, গোঁড়ামির শেষ ছিল না, শাসন ছিল প্রচণ্ড, বাড়ির মেয়ে-বউদের পক্ষে সবই প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। দাদুকে মীরা

বেশী দিন দেখেনি, তবু সেই জাঁদরেল মানুষটির মুখ অস্পষ্ট করে মনে আছে। কেন আছে তা মীরা জানে না। হয়ত এই জন্যে যে, ছেলেবেলায় কয়েকটা বছর তাকে দাদুর কাছেই থাকতে হয়েছিল। বাবা ঘরজামাই হয়ে থাকত।

দাদু মারা যাবার পর সব ওলটপালট হয়ে গেল। মামা-মামীরা দাদুর নিয়মকানুন ভেঙেচুরে তছনছ করে দিল। মীরারা ততদিনে অন্য বাড়িতে চলে গেছে। বাবা কোনো দিনই শ্বশুরমাশাইয়ের ওপর খুশী ছিল না, কিন্তু ভয় পেত। যতদিন শ্বশুরমশাই বেঁচে ছিল—তালতলার বাড়ির এক মহলে বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে পড়ে থাকত চোরের মতন। রাত্রে ঘরের মধ্যে মাকে যা-তা বলত। ভয় দেখাত, একদিন পালিয়ে যাবে।

যখন দাদু মারা গেল, বাবা-মা তালতলার বাড়ি ছেড়ে চলে এল গ্রে স্ট্রীটে তখন থেকে বাবার অন্য চেহারা। বাবা অকর্মণ্য, অক্ষম ছিল না। ব্যবসাপত্রে মাথা ছিল, দাদুর নানা ধরনের কারবার বাবাকে দেখতে শুনতে হত শালাদের সঙ্গে। গ্রে স্ট্রীটে এসে বাবা শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু রাখল না। নিজেই কারবার ফেঁদে বসল, লোহা-লক্কড়ের। কারখানা খুলল বরানগরে।

বাবার কথা মনে পড়লে মীরা অন্য রকম একজন মানুষকে দেখতে পায়। বাবাও একটা খুঁটি, পেছনের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শ্বশুরমশাইয়ের আমলে যা যা সহ্য করতে হয়েছে বাবা যেন তা ভেঙে দেবার জন্যে দশ গুণ জোরে ঘা মারত। তার ফল হল এই, গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে সারা দিনরাত একটা হল্লা চলতে লাগল। কত লোক আসা-যাওয়া করত, বাবার বন্ধুটন্ধু থেকে কর্মচারী, মা নতুন নতুন বন্ধু পেতে শুরু করলঃ কামিনীমাসি, বনোমাসি, বায়কাকিমা—আরও কত। বাবার শখ ছিল গানবাজনার, শ্বশুরের আমলে তালতলার বাড়িতে বাবার সাধ্য ছিল না—সেতার-টেতার কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসে। গ্রে স্ট্রীটে এসে বাবা আর-একবার পুরনো চর্চায় হাত দেবার চেষ্টা করেছিল, দেখল—ও আর হবার নয়। নিজে আর সে চেষ্টা করত না; বাড়িতে আর বাইরে আসর বসাত। গানের সঙ্গে আনুষঙ্গিকও চলত। রেস ধরেছিল বাবা।

ততদিনে মীরার আরও এক ভাই হয়েছে। মীরাও দেখতে দেখতে তেরো চোদ্দ হয়ে উঠল। বাবার হঠাৎ অসুখ করল, লিভারের অসুখ। দেড় দু মাস বিছানায় শুয়ে থাকার পর ডাক্তার বলল, হাওয়া বদল করতে।

. সমস্ত সংসার গুছিয়ে বাবা চলল দেওঘর। তখন থেকে বাবার অভ্যেস দাঁড়াল বছরে একবার করে, শীতের দিকে কোনো শুকনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে এক-দেড় মাস থেকে আসা। মীরারা এইভাবেই কখনো গিয়েছে ভুবনেশ্বর

কখনো ঘাটশিলা, কখনো মধুপুর।

বাবা যে-বছর মারা যায় সেই বছরই গিয়েছিল হাজারিবাগ। মীরার তখন ষোল শেষ হয়েছে। সেবার বাবা বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, মারও শরীর ভাল যাচ্ছিল না। বাড়াবাড়ি শীত সহ্য হবে না বাবার, বুকের শ্লেষ্মা সর্দি বাড়তে পারে—এই ভেবে শীতের শেষে তারা হাজারিবাগ গেল। মাস দুই থাকার ইচ্ছে নিয়ে।

প্রথম দিকটায় বাবার বেশ উপকার হল, মা নিজেও একটু একটু করে ঝরঝরে হয়ে আসছিল। এমন সময় মীরাদের বাড়িতে কলকাতা থেকে মধু-কাকার ছোট শালা নীলেন্দু এল বেড়াতে। শুধু বেড়াতে নয়, বাবার ব্যবসার কিছু কাগজপত্র মধুকাকা নীলেন্দুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নীলেন্দুকে বাড়ির ছেলের মতন সমাদরে নেওয়া হল; আলাদা ঘর দেওয়া হল তাকে, মীরার পাশেই। মা-বাবা থাকত একটা ঘরে, অন্য ঘরে মীরা তার দুই ভাই—সন্তু আর অন্তুকে নিয়ে থাকত। সন্তু বেশ বড়—বছর তেরো বয়েস, অন্তু বছর আষ্টেক। মীরাদের ঘরের পাশে রান্নাঘরে যাবার ফাঁকা জায়গা-টুকুর ওপারে নীলেন্দুকে থাকতে দেওয়া হল।

নীলেন্দুর চেহারা ছিল তাজা। গায়ের রঙ যদিও কালো তবু ছিপছিপে গড়ন, মাথার চুল সামান্য কোঁকড়ানো, লম্বা ধরনের মুখ, জোড়া ভুরু। মোটা ঠোঁট। চোখের পাতাও মোটা ছিল, পুরোপুরি চোখ খুলতে পারত না যেন, হাসলে তার চোখ আধবোজা হয়ে থাকত, দাঁত ঝকঝক করত। কিন্তু নীলেন্দুর ওই ছোট চোখেও ধার ছিল, তীক্ষ্ণ ছিল তার দৃষ্টি।

বাড়িতে এসেই নীলেন্দু মা-বাবার স্নেহ-বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠল। যাদবপুরে পড়ত। মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং। তাসের ম্যাজিক জানত, মাথা নীচু পা উঁচু করে খাড়া থাকার ভেলকিও তার জানা ছিল।

মীরা মোটেই জড়সড় হয়ে থাকার মেয়ে ছিল না তখন। ছেলেবেলায় দাদুর বাড়িতে থাকার সময় যতরকম জড়তা জন্মেছিল গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে এসে সবই সে ভেঙে ফেলেছিল। কিংবা বলা যায়, বাবার কাছে পাওয়া স্বাধীনতায় সে কোনো দিকেই আড়ষ্ট ছিল না। বরং তার কোনো কিছুই আটকাত না, কথা বলা, বেড়ানো, গল্প করা, হাসাহাসি, পা গুটিয়ে বসে নীলেন্দুর সঙ্গে ক্যারাম খেলা।

নীলেন্দু যাব-যাচ্ছি করে মাস খানেক থেকে গেল। ওর মধ্যে জল গড়িয়ে গেল অনেকটা। মীরা প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, তার ভেতরে কি যেন একটা ছটফট করছিল। তার তখন সকাল থেকেই মন টানত নীলেন্দুর দিকে, সারাটা দিন। সুযোগ জুটলেই নীলেন্দু ছিল তার সঙ্গী। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে সন্তু-অন্তুদের কোনো ছুতোয় দূরে সরিয়ে রাখত নীলেন্দু, মীরার তাতে

সায় থাকত। দুজনে কোনোদিন স্টেশনের প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে বসত, কোনোদিন ছাইগাদা পর্যন্ত হেঁটে যেত প্লাটফর্ম ধরে, কোনোদিন মাঠে এসে বসত, পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ত। একদিন মীরাকে চটিয়ে দিয়ে পরে হাসাবার জন্যে নীলেন্দু কোমরের কাছে কাতুকুতু দিয়েছিল মাঠের রুক্ষ মাটিতে বসিয়েই। সেদিন মীরা আশেপাশে আর কাউকে দেখেনি, শুধু একটা বাতাস গোঁ-গোঁ করে উড়ছিল। গরম পড়ছে। বসন্ত চলছে তখন।

তার দু-চার দিন পরেই দোল। মীরাদের বাড়ির পাশেই ছিল এক আশ্রম। নিরিবিলি, শান্ত; পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মন্দির আর চাতাল, ঠাকুরঘর আর গুরুমার থাকার ঘর। মা প্রায় সন্ধ্যেতেই আশ্রমে গিয়ে বসে থাকত, গল্পটল্প করত, পুজোআর্চা দেখত।

দোলের দিন আশ্রমেব উৎসব। এমনিতে আশ্রমে দু-চারজনের বেশী লোক থাকে না। চেঞ্জাররাও শীতের শেষে চলে গেছে একে একে। বড় বড় বাড়িগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। কিন্তু আশ্রমের দোলোৎসবের জন্যে কাছাকাছি থেকে কিছু বাঙালী এসেছিল, যারা কিনা আশ্রমের কেউ না কেউ।

একটু বেলার দিকে আশ্রমে হোলি খেলা শুরু হল। একদিকে পুজোটুজো চলছে। ভোগ চড়েছে। অন্যদিকে হোলি খেলা। বুড়োবুড়িরা রঙ মাখল, সাদা চুলে আবির টকটক করছে, বাবার গায়ের পাঞ্জাবিতে লাল নীল ফিরোজা রঙ, মুখময় আবির। মার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে। কয়েকটি বউ-মেয়ে ছুটোছুটি করে রঙ খেলছে। মীরাও কিছু শুকনো ছিল না।

এমন সময় কোথা থেকে একদল ছেলে বে-রে করতে কবতে আশ্রমে ঢুকে পড়ল। হাতে রঙের বালতি, পিচকিরি, পকেট ভর্তি আবির, হাতের রুমালেও। নীলেন্দু আর মীরা তখন আশ্রমের কুয়োতলার সামনে ছুটোছুটি করে রঙ দেওয়া নেওয়া করছে। ছেলের দল আশ্রমে ঢুকতেই মীরারা থমকে গেল। ওরা আবাব শখ করে খোল করতাল এনেছে। খঞ্জনি এনেছে। গান গাইছিল গলা ফাটিয়ে, হোলির গান।

আশ্রমের ঠাকুরঘর ঘুরে এসেই ছেলেগুলো ডাকাতের মতন তেড়ে যাকে সামনে পেল তাকেই ধরল। চোবাতে লাগল রঙে আবিরে ধুলোয় পারার গুঁড়োয়। ভূত করে ছাড়তে লাগল। একটা পাতলা চেহারার ছেলে, তামাটে রঙ, বড় বড় চুল, ফিনফিনে ঠোঁট—সর্বাঙ্গে কোথাও সাদা বলে কিছু নেই, রঙে রঙে বিচিত্র, কোথা থেকে মীরাকে এসে ধরে ফেলল। তারপর কিছু বুঝতে না দিয়েই বালতির শেষ রঙটুকু তার মাথায় ঢেলে দিল।

মীরা কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। চোখ খোলার আগেই শব্দ শুনল। নীলেন্দু ছুটে এসে ছেলেটার হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে মাথায় মেরেছে। একেবারে আশ্রমের নুড়ি বিছানো রাস্তায় পড়ে গেল ছেলেটা।

নীলেন্দু সেদিন অন্য ছেলেদের হাতে মার খেয়ে মরত। বড়রা ছুটে এসে বাঁচাল তাকে। মাথায় রক্ত নিয়ে ছেলেটা গেল হাসপাতালে।

আর এমনই কপাল, সেই দিনই সন্ধ্যের দিকে মীরাকেও হাসপাতালে যেতে হল। বাড়িতে কেউ ছিল না। মা-বাবা আশ্রমের কীর্তন শুনতে গিয়েছে। নীলেন্দু তাকে এমন একটা অবস্থায় ফেলেছিল যে, মীরা একটা আধ-ভাঙা জানলার কাচে হাত রেখে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। আধ-ভাঙা কাচ ঝনঝন করে ভেঙে বাগানে পড়ল, তলার অর্ধেকটায় মীরার হাত গেল কেটে। কী রক্ত, থামে না। আশ্রম থেকে ছুটে এল সবাই। মীরা প্রায় অজ্ঞান। ওই অবস্থায় তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল লোকে।

পরের দিন অনেকটা বেলায় মীরাকে আবার নিয়ে যেতে হল হাসপাতালে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে, ব্যান্ডেজ ভিজে গেছে।

হাসপাতালে ছেলেটিকে নতুন করে দেখল মীরা। মাথার ক্ষত দেখাতে এসেছে। যদিও তার মাথায় পট্টি বাঁধা।

ছেলেটি মীরাকে দেখে কিছু বলল না। ম্লান একটু হাসল।

নীলেন্দু আর থাকল না। দোলের পরের দিনই পালাল। চোরের মতন।

হাত নিয়ে মীরা বিছানায় পড়ে থাকল দশ পনেরোটা দিন। সেই ছেলেটির কথা তার মনে পড়ত। কিন্তু তাকে আর কোনোদিন দেখতে পেল না।

কলিং বেলের আওয়াজ পেল মীরা। প্রায় যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। বিশ্রী লাগল আওয়াজটা। উঠতে ইচ্ছে হল না। বিরক্ত লাগল। রাধা নয়। রাধা এভাবে বেল বাজায় না। নীচের ফ্ল্যাটের কেউ? পাড়ার কোনো বউ মেয়ে?

আবার বেল বাজাতেই মীরা বিরক্ত মুখে উঠল। শেষ শীতের দুপুর, এখনও সরে যায়নি।

অগোছালো শাড়ি; আঁচলটা আলগা করে কাঁধে ফেলে মীরা দরজা খুলতে গেল।

দরজা খুলতেই মীরা সুরপতিকে দেখল দাঁড়িয়ে আছে।

চমকে উঠেছিল যেন মীরা। অবাক। বিশ্বাস হয়েও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সুরপতি দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে মীরা সরে গেল। ঘরে এল সুরপতি।

"আপনি?" মীরা চোখের পাতা ফেলতে পারছিল না।

সুরপতি বলল, "আবার ফিরে এলাম।"

মীরা বলতে যাচ্ছিল, কেন এলেন? বলতে পারল না।

সুরপতিকে রুক্ষ, শুকনো, রোদে পোড়া, পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। চোখে মুখে সামান্য ঘাম। সুরপতি নিজেই বলল, "বুকটায় বড় ব্যথা করছিল। ফিরে এলাম। এক গ্লাস জল খাওয়ান।"

মীরা দেখল, সুরপতি দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে।

পাঁচ

সুরপতি এমন ভাবে বসে থাকল যেন তার শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সোফার ওপর সমস্ত পিঠ হেলিয়ে দিয়ে মাথা তুলে ছাদের দিকে চোখ করে সে বসে থাকল। হাত পা শিথিল। চোখের পাতাও আধ-বোজা।

মীরা সুরপতিকে জল এনে দিয়েছিল আগেই, পিপাসা মেটেনি সুরপতির। আবার জল এনে দিয়ে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল। একলা বসেছিল সুরপতি, ঘরের কোনো দিক থেকে সরাসরি আলো আসছে না, জানলার কাঠের পাললা ভেজানো, পরদাও টেনে দেওয়া। ছায়া জড়ানো, কোথাও, কোথাও কালচে হয়ে আসা এই স্তব্ধ ঘরে সুরপতিকে নিঃসাড় বসে থাকতে দেখলে মনে হবে যেন মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে। বা সে মৃত।

সুরপতির হাত পা নড়ছিল না; খুব ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল সে, চোখের পাতাও বুজে আসছিল।

মীরা করিডোরে খাবার টেবিলের সামনে চুপ করে বসে ছিল। এই দুপুর ফুরোতে এখনও কিছু দেরী রয়েছে। দুপুরের পর বিকেল। বিকেল শেষ হলে সন্ধ্যের মখে প্রমথ আসবে। সব দিন ঠিক সন্ধ্যের মুখে মুখেও প্রমথ আসে না, কাল যেমন এসেছিল বন্ধুকে নিয়ে। কোনো কোনোদিন দেরী করেও ফেরে। প্রমথ কখন ফিরবে বলা যায় না। বাড়িতে মীরা একা। রাধা ঘরের কাজকর্ম সেরে নীচে গিয়েছে, বিকেলের আগে সে-ও ওপরে আসবে না। রাধাকে নীচে থেকে ডেকে আনা যেতে পারে। কিন্তু কেন?

অপ্রসন্ন অথচ অসহায় মুখ করে মীরা বসে থাকল। ভাল লাগছিল না। স্পষ্ট কোনো ভয় নয়, তবু কোথায় যেন কেমন বিপন্ন বোধ করছিল, মাঝে মাঝেই তার নিঃশ্বাস কিছু দীর্ঘ হয়ে উঠছিল।

এ ভাবে বসে থাকা যায় না। সুরপতি বাইরের ঘরে, সে ভেতরে খাবার টেবিলে বসে। প্রমথকে একটা ফোন করতে পারলে ভাল হত। মীরাদের ফোন নেই। বছর চার পাঁচ ধরে হাঁ করে বসে থেকেও ফোন পাওয়া গেল না। নৃপেনবাবুদের ফোন আছে। নীচে গিয়ে মীরা প্রমথকে অফিসে একটা ফোন করতে পারে। বলতে পারে, 'তোমার বন্ধু ফিরে এসেছে।' কিন্তু প্রমথকে এ কথা জানিয়ে কোনো লাভ আছে? প্রমথর দুশ্চিন্তা দূর হবে।

মীরা বেশ বুঝতে পারল, প্রমথর দুশ্চিন্তা দূর করার চেয়েও নিজের বিপন্নতা যেন তাকে আরও বিব্রত করছে।

ফ্রিজের দিক থেকে শব্দ হল। মোটরের ঘিসঘিস শব্দ। মিহি শব্দর দিকে কান পেতে থাকল মীরা। আচমকা কেমন একটা বিরক্তি এল, রাগ। সুরপতির জন্যে এত ভয়ের কি আছে?

বসার ঘর থেকেও কোনো সাড়া শব্দ আসছে না। মানুষটা করছে কী? চুপ করে বসে আছে? ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি বুকের ব্যথা সামলাচ্ছে? একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলবে নাকি? মীরার মামা কাগজ পড়তে পড়তে মারা গিয়েছিল। হার্ট অ্যাটাক।

মীরা আর বসে থাকতে পারল না। উঠল।

সুরপতি কেমন আচ্ছন্নের মতন বসে ছিল।

মীরা দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকল। অপেক্ষা করল সামান্য, বলল, "শরীর খারাপ লাগছে?"

সুরপতি কথা বলল না প্রথমে। যেন শুনতে পায়নি। কয়েক মুহূর্ত নড়ে চড়ে বসল। তাকাল। "ভাল লাগছে না।"

মীরা কিছু ভাবল। "এখনও ব্যথা রয়েছে?"

"আছে।"

"কী করবেন?"

"কিছু না। ভাবনার কিছু নেই। আমার এ-রকম মাঝে মাঝে হয়।"

মীরাব মনে হল, ঘরের জানলাগুলো খুলে দেওয়া উচিত। এত ঝাপসা ভাব তার ভাল লাগছে না। কিছু যেন এই ঘরের মধ্যে ক্রমশই ভারী হয়ে আসছে। কিছু একটা ঘটে যেতে পারে—যে কোনো মুহূর্তে—অথচ কী যে বোঝা যাচ্ছে না—এই রকম লাগছিল।

জানলা খুলতে যাচ্ছিল মীরা। "জানলাগুলো খুলে দিই?"

সুরপতি বলল, "আমার দরকার নেই।"

মীরা দাঁড়াল। দু মুহূর্ত ভাবল। "দুপুর শেষ হয়ে এসেছে।"

"আমি অনেক ঘুরেছি। রোদে রোদে।"

"কোথায় চলে গিয়েছিলেন আপনি?" মীরা জিজ্ঞেস করল এই প্রথম। "আপনার বন্ধু ঘুম থেকে উঠে দেখতে না পেয়ে রাগ করছিল; দুশ্চিন্তা করেছে।"

সুরপতি সোজা হয়ে বসল; মীরার দিকে তাকাল। "প্রমথ আজ নিজেই চমকে যাবে।"

"চমকে যাবে?"

"অফিস থেকে ফিরে এসে দেখবে আমি ঘরে।"

মীরা খুশী হল না। বলল, "আপনারা দুজনে কি চমকে দেবার খেলা খেলছেন?"

সুরপতি হঠাৎ হাই তুলল। বাঁ হাত মুখের ওপর রাখল। গা ভেঙে যেন ক্লান্তি কাটাল। বলল, "আমরা খেলছি না, কেউ খেলাচ্ছে।"

মীরা হেঁয়ালিটা গায়ে মাখল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এখন কী করবেন? স্নান খাওয়া হয়নি তো?"

"স্নান হয়নি; কিছু খেয়েছিলাম।"

সুরপতিকে অবসন্ন দেখাচ্ছিল। কালচে। মাথার চুল ধুলো ভরা। চোখ মুখ বসে যাওয়া। মীরা বুঝতে পারল না কী বলা যায়! স্নান করতে বলবে? না খেতে? এই মুহূর্তে কি যে খেতে দেওয়া যায় তাও ঠিক করতে পারছিল না।

"তা হলে স্নান করবেন?" মীরা জিজ্ঞেস করল।

সুরপতি কিছু ভেবে বলল, "করলে হত। অস্বস্তি লাগছে।"

মীরা আর দাঁড়াবার দরকার মনে করল না। বলল, "এই অবেলায় ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে পারবেন?"

সুরপতি তাকাল। "বোধ হয় আরাম পাব।"

মীরা যেন আপাতত বেঁচে গেল। এই ঘরের ছায়াচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা, অন্ধকার ভাবটা তার পছন্দ হচ্ছিল না। সুরপতিকে এখানে একলা বসিয়ে রাখতেও তার ভয় করছিল।

স্নান শেষ করে সুরপতি আরাম পাচ্ছিল। অবসাদ এখন আর সর্বাঙ্গে পুরু ধুলোর মতন মাখামাখি হয়ে নেই, শরীরের মধ্যে হালকা করে ছড়িয়ে রয়েছে। চোখ সামান্য জ্বালা করছিল। অনেক কাল ধরেই এই জ্বালা সহ্য করে আসছে সুরপতি তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ নয়, তবু চোখের তলায় কেন কারণে অকারণে জ্বালার ভাব আসে সে জানে না। আজ হয়ত অন্য কারণে এসেছে, রোদে রোদে ঘুরে এই ঠাণ্ডা জলে স্নান করে। গা করল না সুরপতি।

সকালে যাবার সময় যেভাবে বিছানাটা ফেলে গিয়েছিল সুরপতি সেভাবে আর পড়ে নেই; মশারি আর কম্বল ঘরের এক কোণে সরিয়ে রাখা, বিছানার ওপর মোটা ধরণের রঙচঙে চাদর পাতা। অন্য সব—এই ঘরের আর যা কিছু—যেমন ছিল, তেমনই আছে। ঘরের জানলাগুলো কেউ খুলে দিয়ে গিয়েছে। স্নান সেরে এসে সুরপতি দেখল, কোথাও কোনো আবছায়া নেই, বাইরে দুপুর ফুরিয়ে বিকেল নামছে। এখনও শেষ মাঘের স্বল্প রোদ, ম্লান আলো পাশের ঘরবাড়ির মাথা ডিঙিয়ে চলে যায়নি, ছায়াও নেমেছে পথে কোথাও কোথাও গাঢ় হয়ে। বাতাসে ধুলো উড়ছিল, সামান্য ধূসরতাও যেন

চোখে পড়ে।

মীরা চায়ের সঙ্গে কিছু মিষ্টি রেখে গিয়েছিল। সুরপতি মিষ্টি নিল না। চা নিল।

সকালে যাবার সময় সুরপতি ভাবেনি, সে আবার এই ঘরে ফিরে আসবে। কেন এল? এক-এক সময় মনে হচ্ছে, সুরপতি ঠিক নিজের ইচ্ছায় আসেনি, আসার জন্যে তার সচেতন কোনো ব্যাকুলতা ছিল না, কোনো অজ্ঞাত দুর্বোধ্য কৌতূহলই যেন তাকে টেনে এনেছে। আবার এমনও মনে হচ্ছে, নিজেই ফিরে এসেছে সুরপতি, নিজেরই আগ্রহে। মানুষের স্বেচ্ছায় কিছু করা বা অনিচ্ছায়—এর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য বোঝা যায় না। অন্তত সুরপতি বুঝতে পারছে না—তার ফিরে আসার মধ্যে নিতান্তই অনিচ্ছা আছে কি না। তবু, সুরপতি জানে যে, যখন ভোরবেলায় প্রমথর বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তখন তার মধ্যে কেমন এক নিস্পৃহতা ছিল, প্রমথ বা মীরার জন্যে তার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু পরে, ক্রমশই সুরপতি অনুভব করতে পারল, কী যেন তাকে পেছনে টানছে। বার বার পেছনে টানলে যেন কেমন লাগে, মনে হয়—কোথাও কিছু ফেলে আসা হয়েছে, কিছু যেন হারিয়ে এসেছি, এমন কিছু পড়ে থাকল যা রেখে এলাম। সুরপতির অবশ্য এই ধরনের কথা পুরোপুরি মনে হচ্ছিল না, কিন্তু সে বার বার, থেকে থেকে পেছনের একটা টান অনুভব করছিল। যতবারই সুরপতি মাথা ঝেড়ে মন থেকে এই টানটা ফেলে দেবার চেষ্টা করেছে দেখেছে ভাব মন কোনো কাজ করছে না, তার সাধ্য হচ্ছে না-পেছনের দিকটা ঝেড়ে ফেলা। বরং সুরপতির মনে হল, তার চোখ যেন মাথার পেছন দিকে চলে গেছে, সে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেও চোখ পেছনে পড়ে আছে।

অনর্থক, অকারণে কয়েক ঘন্টা ঘোরাঘুরি করে সুরপতি শিয়ালদায় চলে গেল। ব্যারাকপুর ফিরে যাবার ইচ্ছে। স্টেশনে গিয়েও সুরপতি প্লাটফর্মে ঢুকল না। রিফ্রেশমেন্ট রুমে ঢুকে কিছু খেল। তারপর মাথায় হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকল। এই সময় তার বুকে ব্যথাটা খুব মৃদুভাবে বার কয়েক এল গেল। অত গা করল না সে।

সুরপতি ভাবল, এখন আর ব্যারাকপুরে ফিরে গিয়ে কাজ নেই। বরং প্রমথর অফিসে যাওয়া যাক। তাকে কোনো কিছু না জানিয়ে তার বাড়ি থেকে চলে যাওয়াটা অন্যায় হয়েছে। প্রমথর সঙ্গে দেখা করে সুরপতি আউটরাম থেকে বাস নেবে। বাসেই ব্যারাকপুর ফিরবে।

প্রমথর কাছে যেতে গিয়েও যাওয়া হল না। অন্যমনস্কভাবে সে ভুল ট্রামে উঠল। ট্রামটা হাওড়া যাচ্ছিল। নিজের ভুল খেয়াল হবার পরেও সুর-পতি নামল না। তার বুকের তলায় ব্যথাটা বার বার আসা-যাওয়া করছিল।

ট্রামের জানলা ঘেঁষে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকল।

হাওড়ায় পৌঁছে আবার ফেরার সময় সুরপতি কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ল। যেন ভেতর থেকে লুকোনো জ্বর এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মৃদু একটা কাঁপুনি উঠছিল হাত পায়ে, মাথা ভার, বুকের ব্যথাটা আরও তলায় স্থির হয়ে বসে আছে।

সুরপতি এমন জায়গায় নেমে পড়ল যেখানে স্তূপীকৃত আবর্জনা জমে আছে। বাতাসে দুর্গন্ধ, নোংরা উড়ছে, রাশিকৃত মাছি।

রোদের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল। কোথায় সে খেয়াল করল না।

মীরা ঘরে এসেছিল। এসে দেখল, সুরপতি জানলার কাছে চেয়ার নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মীরা।

"আপনি কিছু খেলেন না?" মীরা বলল।

সুরপতি ঘাড় ঘোরাল, দেখল মীরাকে। মাথা নাড়ল। "না চা খেয়েছি।"

মীরা যেন ইতস্তত করল, বলল, "আমি ভাবছিলাম আপনাকে কিছু করে দি—খাওয়া-দাওয়া করেননি।"

সুরপতি হাত নাড়ল।

মীরা দাঁড়িয়ে থাকল। রাধাকে ডেকে এনেছে মীরা। ময়দা মাখতে বলেছে।

"প্রমথ খুব রাগারাগি করেছে?" সুরপতি জিজ্ঞেস করল।

"করাই তো উচিত।"

একটু চুপচাপ। সুরপতি জানলার বাইরে তাকাল। আবার মুখ ফিরিয়ে মীরার দিকে তাকাল। "আমি প্রমথর অফিসে যাব ভেবেছিলাম খবর দিতে, যাওয়া হল না।"

"কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?"

"ব্যারাকপুরে যাব ভেবেছিলাম," সুরপতি বলল, "আপনি বসুন।"

মীরা বসল না। বলল, "সকালে যাবার আগে আমাদের বলে গেলে পারতেন।"

"আপনারা ঘুমোচ্ছিলেন, দরজা বন্ধ ছিল।...ওই মেয়েটি—কাজ করা মেয়েটিকেও দেখতে পাইনি।"

মীরা অকারণ তর্ক করল না।

সুরপতি আবার বসতে বলল মীরাকে। মীরা দাঁড়িয়ে থাকল।

সামান্য অপেক্ষা করে সুরপতি বলল, "প্রমথ আমাকে কয়েকটা দিন এখানে থেকে যেতে বলেছিল। আপনি জানেন?"

মীরা কথার জবাব দিল না। প্রমথ তাকে কিছু বলেনি। দু বন্ধু মিলে

কাল কত গল্প হয়েছে, কী কী কথা হয়েছে, মীরা তা জানে না। জানার সুযোগই হয়নি। খাওয়াদাওয়া শেষ করে প্রমথ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে, নেশার ঘোরে ঘুমিয়েছে, মীরার সঙ্গে কথা বলার সময় হল কোথায়? আর আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বন্ধুকে না দেখতে পেয়ে প্রমথর মন-মেজাজই খারাপ হয়ে গেল তাতে কথাটা তুলবে কখন! তা ছাড়া, যে লোক নেই তার থাকার কথা উঠবে কেন!

সুরপতি মীরার মুখ দেখছিল। মীরার নাকের ডগার পাতলা হাড় উঁচু হয়ে রয়েছে, ঠোঁট অল্প চাপা, দাঁতের ধার দেখা যাচ্ছিল। একটা সাদা শাড়ি পরনে, কালো পাড়, জরির রেখা রয়েছে। গায়ের জামাটা সাদা, মসৃণ।

সুরপতি বলল, "কাল রাত্রে আমার একটা কথা বার বার মনে পড়ছিল।"

মীরা তাকাল। তার দৃষ্টি অনেকটা তীক্ষ্ণ, স্থির।

"এ-রকম ঘটনা সব সময়েই ঘটে না, অথচ ঘটে—" সুরপতি বলল, "আমাদের জীবনটা কোনো ছকে চলে কি চলে না আমি জানি না। অনেক সময় মনে হয়, চলে। কই, আপনি বসুন—।"

মীরা খাটের পাশে গিয়ে বসল।

সুরপতি মীরাকে পরিপূর্ণ চোখে দেখতে লাগল। সাদা শাড়ির জন্যে মীরার মধ্যে আরও বয়স্কের ভাব এসেছে, আরও লাবণ্য।

"আমি যখন কাল প্রমথর অফিসে যাই তখন একেবারে না জেনে যাইনি। আমাদের এক পুরোনো বন্ধুর কাছে একটা কাজে গিয়েছিলাম। সে আমায় প্রমথর কথা বলল। অফিসের ঠিকানা দিল। প্রমথকে পাব জেনেই আমি তার অফিসে গিয়েছিলাম। পেলামও।" সুরপতি একটু থামল, মীরার পায়ের দিকে তাকাল। কাঁপছে না। স্থির হয়ে আছে। মীরা কেমন ধৈর্যহীন হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সুরপতি আবার বলল, "কিন্তু প্রমথ যখন আমায় এখানে নিয়ে এল—আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি আপনাকে দেখতে পাব।"

মীরা যেন কেঁপে গেল। নিঃসাড়। পাথরের মতন বসে থাকল।

সুরপতি নিজের ঠান্ডা কপালে হাত রাখল। মুখ নিচু করল। মেঝের সাদাটে মোজাইকের ওপর কালো পাথরের দানাগুলো যেন চোখের সমস্ত কিছু কালো করে দিচ্ছিল।

মীরা গলায় শব্দ পাচ্ছিল না। বুকের তলায় কাঁপছে। পায়ের তলাটা বড় ঠান্ডা লাগল।

নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে মীরা অবাক হবার ভান করল। "আপনি আমায় আগে দেখেছেন?"

সুরপতি মুখ তুলল। ঘন দৃষ্টিতে তাকাল মীরার দিকে। "দেখিনি?"

মীরা মাথা নাড়ল। "কেমন করে দেখবেন?"

"কে কাকে কখন দেখেছে জোর করে বলা যায় না যেমন, আবার কখনও কখনও কাউকে দেখলে—"

মীরা অসহিষ্ণু হয়ে কথার মধ্যে বাধা দিল। বলল, "আপনার ভুল হতে পারে।"

"হতে পারত। প্রথমে তাই ভেবেছিলাম।...কিন্তু পরে দেখলাম ভুল নয়।"

মীরা রূঢ় হবার চেষ্টা করল, "আপনাকে আমি আগে দেখিনি।"

সুরপতি আহত হল না, নরম গলায় বলল, "বোধ হয় লক্ষ্য করেননি। লক্ষ্য করার মতন আমি ছিলাম না।"

মীরা ঠোঁট ভিজিয়ে দাঁতে চেপে ধরল। তার চোখে রুক্ষতা। "কোথায় দেখেছেন আমাকে?"

সুরপতি শান্তভাবে বলল, "আমার ভুল হতে পারত। হল না—আপনার হাতের ওই কাটা দাগটার জন্য।"

মীরা কিছু বলতে পারল না। সে অবাকও হল না। সুরপতি তাকে দেখছে। মীরা তাকাল না। যেন কোনো সর্বনাশ রয়েছে সুরপতির দৃষ্টিতে। মীরার সেই স্তব্ধ ভাবটা কয়েক মুহূর্ত পরেই নষ্ট হয়ে গেল। আচমকা একটা আক্রোশ কোথা থেকে লাফ মেরে মাথায় এসে বসল। মীরা কিছু বলতে চাইছিল, পারল না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

ছয়

প্রমথ সন্ধ্যের পর পরই অফিস থেকে ফিরল। সুরপতি ছিল বসার ঘরে। দরজা খুলে দিল।

সুরপতিকে দেখে প্রমথ অবাক। এরকম সে আশাই করেনি। বলল, "এ কিরে, তুই?"

সুরপতি সকৌতুক মুখ করে বলল, "তোকে চমকে দেব বলে—"

ততক্ষণে প্রথম চমকটা ভেঙে গেছে প্রমথর, কৌতূহল রয়েছে পুরোমাত্রায়; বলল, "তা দিয়েছিস। কিন্তু তোর ব্যাপার কী? সকালে উধাও, সন্ধ্যেতে হাজির?"

কথার জবাব না দিয়ে হাসল সুরপতি।

হাতের ভার লাঘব করে প্রমথ সোফায় বসে পড়ল, টাই আলগা করতে করতে বলল, "তুই আমায় সকালে যা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলি, কাউকে কিছু না জানিয়ে কেটে পড়লি! ছেলেমানুষি! আমি শালা ভেবে মরি, হল কী?" প্রমথ টাইটা খুলে ফেলে পাশে রাখল। "অফিস থেকে ভাবলাম, হাসপাতাল টাসপাতালে ফোন করি, কি জানি গাড়ি চাপা পড়ে মরলি নাকি?"

সুরপতি হাসতে হাসতেই বলল, "আমায় খুব গালাগাল দিয়েছিস সারাদিন?"

"দেব না! বাঃ!...তুই এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত কাটিয়ে ভোর বেলায় চোরের মতন যদি পালাস তবে শালা তোকে কে না গালাগাল দেবে!...আমি আবার ত্রিদিবকে ফোন করলাম; বললাম—সুরপতি কলকাতায় এসেছে, কাল আমার বাড়িতে রাত্তিরে ছিল—সকালে বেপাত্তা, ব্যারাকপুরে কোথায় থাকে—কিচ্ছু জানি না, হোয়াট টু ডু? ত্রিদিব কি বলল জানিস?"

সুরপতি শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

"ত্রিদিব বলল, পুলিসে খবর দিতে। বলল, শালাকে স্মাগলার বলে চালিয়ে দে—পুলিস ধরে আনবে। তারপর বেটাকে নিয়ে আয় এখানে চাঁদ মুখটা দেখি—" বলে প্রমথ হেসে উঠল। তারপর আবার বলল, "সত্যি সুরপতি তুই কত খেলাই খেলতে পারিস! কী হয়েছিল তোর?"

সুরপতি বলল, "কিছু হয়নি। এমনি। তোকে অফিসে গিয়ে জানাব ভেবেছিলাম, পারিনি। কিছু মনে করিস না।"

প্রমথ মাথা নেড়ে বলল, "না না, ব্যাপারটা চেঙড়ামি নয়। আজকাল যা অবস্থা তাতে সবসময়ই ভাবনা হয়।"

সুরপতি স্বীকার করে নিল। বলল, "এখন যা, তোর ধড়াচুড়ো ছাড় গে যা। পরে বলব।"

প্রমথ একটু বসে থাকল। অফিসফেরার ক্লান্তি, মালিন্য। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট লাইটার বের করল। সুরপতিকে দিল, নিজেও নিল। "কখন এসেছিল তুই?"

"দুপুরে।"

"দুপুরে? আমি চলে যাবার পর? মীরা আমায় অফিসে একটা ফোন করে দিলে পারত...।"

সুরপতি বলল, "দুপুরে মানে প্রায় বিকেলের দিকে।"

"ও।"

প্রমথ আরও কয়েকটা টান সিগারেট খেয়ে উঠে পড়ল। "বোস তাহলে; আমি ফ্রেশ হয়ে নি।"

ঘরে এসে প্রমথ দেখল, মীরা খোলা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কোটটা বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে প্রমথ বলল, "সুরপতি দুপুরে ফিরেছে?"

মীরা কোনো জবাব দিল না। প্রমথ মীরার ঘাড় পিঠ দেখতে পাচ্ছিল, মুখ নয়। মীরা আলমারির দিকে ঝুঁকে রয়েছে। সামান্য কুঁজো হল। কিছু খুঁজছে।

"কী বলল ও?" প্রমথ আবার জিজ্ঞেস করল।

মীরা এবারও জবাব দিল না। জবাব না দিয়ে সে তার হাতের কাজ সারল। আলমারি বন্ধ করল।

প্রমথ কিছু বুঝতে পারছিল না। মনে হল, মীরা অখুশী। এ সব সময় মীরাকে খুশী মুখে দেখতেই প্রমথ অভ্যস্ত। কখনও সখনও হয়ত তাকে অন্য রকম দেখায়। কিন্তু সে অন্য কারণে।

"কী হয়েছে?" প্রমথ আবার জিজ্ঞেস করল, এবার কেমন অসহিষ্ণু।

মীরা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। বলল, "কিছু নয়।"

স্ত্রীর গম্ভীর মুখ দেখছিল প্রমথ। এই গাম্ভীর্য সে পছন্দ করে না। ভয়ও করে। সাংসারিক অশান্তি এড়িয়ে থাকার জন্যে প্রমথ সব সময়ই স্ত্রীর বাধ্য থাকাই ভাল মনে করেছে। মীরার ব্যক্তিত্ব বেশী না কম তা নিয়ে প্রমথ মাথা ঘামানো দরকার মনে করে না। হয়ত মীরার বেশী, প্রমথর কম। প্রথম থেকেই, বিয়ের পর পরই, প্রমথ তার সুন্দরী স্ত্রীর কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। বিরোধের মধ্যে বড় একটা যাবার চেষ্টা করেনি। দেখেছে, এখানে সে অক্ষম।

প্রমথ কোটটা বিছানা থেকে তুলে নিল। হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখবে। "তোমার শরীর খারাপ?"

"মাথা ধরেছে", মীরা বলল। বলেই কিছু যেন মনে পড়ল, বলল, "আজ-কাল আর বাড়িতে ঝি চাকর রেখে লাভ নেই। সব সময় একটা না একটা ছুতো।"

প্রমথ খানিকটা স্বস্তি পেল। রাধাকে নিয়ে কিছু হয়েছে।

"কী হল? " প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"কী আবার—! রাধা শিবপুরে চলে গেল; তার ভাশুরপো নাকি মরমর।"

প্রমথ হেসে ফেলল। "কাল তো ফিরবে?"

"জানি না। বলে গেল ওর বোন কাজ করে দেবে। এখন ওর বোনকে ডাকতে নীচে যাও—!"

প্রমথ স্ত্রীর সঙ্গে রঙ্গ করার চেষ্টা করল, "যাব নাকি?"

মীরা বিরক্ত হল। বলল, "তামাশা করতে হবে না। নাই পেলে সব মাথায় ওঠে। রাধাকে যত তোয়াজ করি সে তত আদিখ্যেতা করে। গ্যাস ফুরিয়ে গেছে—বললাম দোকানে খবর দিয়ে যাও—বলল, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।"

প্রমথ গায়ের জামাটা খুলতে লাগল। "ছাড়িয়ে দাও।"

"দাও না, তুমিই দাও—। একটা নিয়ে এস আগে তারপর ছাড়িয়ো। ঝি চাকরের এখন স্বর্গ—!"

প্রমথ স্বস্তি অনুভব করছিল। মীরার মেজাজ খারাপের ব্যাপারটা আলাদা। রাধাকে নিয়ে।

মীরা চলে গেল।

প্রমথ বেশবাস খুলতে লাগল। সুরপতি ফিরে এসেছে। প্রমথ ভাবে নি, ও আবার ফিরে আসবে। ভালই করেছে এসে। না এলে একটা দুশ্চিন্তা থেকেই যেত কোথায় গেল, কেন গেল, কী হল? অফিসেও প্রমথ সুরপতির কথা ভেবেছে। এক সহকর্মীকে কথাটা বলতেই সে উলটো গাইল। বলল: 'দেখুন আবার বাড়ির কিছু নিয়ে সরে পড়েছে নাকি! বন্ধুটন্ধুরাও আজকাল রিলায়েবল হয় না।' কথাটা শুনে প্রমথ ভীষণ চটে গিয়েছিল। কী অক্লেশে লোকজন আজকাল কথা বলে, যে কোনো কথা।

বাথরুমে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে প্রমথ, মীরা আবার ঘরে এল।

"তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে?" মীরা নিজেই জিজ্ঞাসা করল।

প্রমথ ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজের মতন মাথার ওপর দু হাত উঠিয়ে ডান পাশ বাঁ পাশে হেলে পড়ছিল, পিঠ আর শিরদাঁড়ার টনটনে ভাবটা কাটাবার চেষ্টা আর কি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "কই, কিছু বলে নি। বলছিল, আমার অফিসে গিয়ে খবর দেবে ভেবেছিল, যেতে পারেনি।"

মীরা শুনল; কথা বলল না।

"বিকেলে ফিরেছে?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"ঘড়ি দেখি নি।"

"তাই তো বলল—!"

"তবে তাই।"

প্রথম স্ত্রীর এরকম নিস্পৃহতার কারণ বুঝতে পারছিল না। "তুমি ওর ওপর চটে রয়েছ মনে হচ্ছে?"

"আমি! কেন?"

"তখন জিজ্ঞেস করলাম, কথার কোনো জবাবই দিলে না। এখনও...।"

মীরা কিছুটা রুক্ষভাবে বলল, "তোমার বন্ধুর খোঁজ খবর তুমি আমার কাছে জানতে চাইছ কেন? আমি কেমন করে জানব, কেন উনি সকালে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন? আবার ফিরেই বা এলেন কেন? যা জানার তুমিই জানতে পার।"

প্রমথ স্ত্রীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। স্ত্রীর মুখ সে চেনে, আজ তেরো চোদ্দ বছর এই মুখ সে দেখে আসছে, মীরার মুখের প্রতিটি রেখার সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা তার চেনা। কখনও কখনও স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রমথ বিরক্ত হয়, এমন কি ঘৃণাও করে। এখন প্রমথর ঘৃণা হচ্ছিল। রাধা নয়, মীরার রাগের কারণ সুরপতি। কিন্তু কেন? সকালেও মীরা সন্তুষ্ট ছিল না। প্রমথ সকালের ব্যাপারটাতে গা দেয় নি, কারণ সে নিজেই রাত্রের বেচাল অবস্থাটার জন্যে কুণ্ঠিত ছিল, তার ওপর সুরপতির কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়ার অপরাধটাও তাকে বিব্রত করছিল। মীরা সেই সকাল থেকেই কিন্তু অসন্তুষ্ট এখনও।

প্রমথ ক্ষুণ্ণ হল। বলল, "তুমি অত চটে যাচ্ছ কেন? এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

মীরা বলল, "না, আমায় করবে না। তুমি যে তোমার বন্ধুকে থাকতে বলেছ তা কি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে?"

প্রমথ কেমন অবাক হল। অবাক হল—কেননা সুরপতিকে থাকতে বলার ব্যাপারটা কথাপ্রসঙ্গে সে বলেছিল মাত্র, কোনো কিছু স্থির করে নয়। সুরপতি যে থাকবে তাও তার মনে হয় নি। সুরপতিও থাকবে বলে নি। যা নিতান্তই মুখের কথা, বন্ধুতে বন্ধুতে হয়েছে গল্পটল্পর সময়ে—সেটা মীরাকে বলার কোনো দরকার ছিল কী? তা ছাড়া যাকে রাখার কথা—সেই তো সকাল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

প্রমথ বলল, "সুরপতি তো চলেই গিয়েছিল—।"

মীরা রুক্ষভাবে বলল, "আবার ফিরে এসেছে।"

প্রমথ স্ত্রীর মুখে কেমন যেন কাঠিন্য ও নোঙরামি দেখল। কথার জবাব দিল না।

বাথরুমে প্রমথ ওয়াশ বেসিনের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। হাত মুখের সাবান শুকিয়ে এল। ছোট জানলার ওপারে অন্ধকার। বাথরুমের আলোটা তেমন জোরালো নয়। পায়ের কাছে প্লাস্টিকের নীল বালতির মধ্যে মীরার শাড়ি সায়া পড়ে আছে, তোয়ালে ঝুলছে একপাশে, শাওয়ারটা মাথার ওপব ফণার মত দাঁড়িয়ে।

প্রমথ একটুও খুশী হচ্ছিল না। খুশী হচ্ছিল না কারণ—মীরা সুরপতিকে একেবারেই পছন্দ করছে না। কাল এটা বোঝা যায়নি। আজ বোঝা যাচ্ছে। কেন মীবা সুরপতিকে অপছন্দ করছে তাও প্রমথ জানে না। এমন হতে পারে, মীরা ভাবছে—সুবপতি তার স্বামীর মাথায় কাঠাল ভাঙতে এসেছে। সুরপতিকে দেখলে মনে হয় না যে সে যথেষ্ট পয়সা পকেটে নিয়ে বেঁচে আছে। খুবই সাধারণ দেখায়, মামুলি বেশবাশ, কোথাও কোনো চাকচিক্য নেই। রাস্তার ফেরিঅলা মনে হবার কোনো কারণ না থাকলেও তাকে যে মোটামুটি দীন দেখায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মীরা কি ভাবছে সুরপতি প্রমথর সাহায্যপ্রার্থী? সেই জন্যেই পছন্দ করছে না?

সুরপতি যদি সাহায্যপ্রার্থী হত—যা সে নয়—তবু স্বামীর বন্ধুকে এমন অবজ্ঞা করা মীরার উচিত নয়। এ বাড়িতে, কিংবা অন্য বাড়িতে—যেখানে প্রমথরা আগে থাকত—যারা এসেছে এবং থেকেছে তারা সকলেই মীবার লোক, প্রমথর নয়। অনেক ভেবেও প্রমথ মনে করতে পাবে না—একবার মা এসে মাসখানেক তার কাছে ছিল, আর একবার এক ভাগ্নে এসে দিন চার পাঁচ—এ-ছাড়া প্রমথর আর কেউ কোনোদিন তার বাড়িতে এসেছে। মা আর কোনোদিন তার বাড়িতে এসেছে। মা আর কোনোদিন আসবে না—কারণ মা আব নেই। বাবা আগেই গিয়েছিল প্রমথর নিজের বলতে এক বোন ছিল, সেও বছর পাঁচেক হল মারা গেছে ছেলে হতে গিয়ে। বয়েসে দ্বিতীয় বাচ্চা হচ্ছিল, কোথায় কি গণ্ডগোল হয়ে মারা গেল। ভগিনীপতির সঙ্গে প্রমথব কোনো সম্পর্ক নেই, থাকেও বহুদূরে।

মীরাকে বিয়ে করার পর থেকে প্রমথ দেখেছে, তাদের বাড়িতে যারা এসেছে, থেকেছে—এবং এখনও আসে তারা মীরার লোক। মীরার নিজের বলতে দুই ভাই, সন্তু দিল্লীতে—ভাল চাকরি বাকরি করে; অন্তু দক্ষিণেশ্বরে থাকে। ব্যবসাপত্র করে। মীরার মাও ছেলের কাছে দক্ষিণেশ্বরে। মীবার মামাতো ভাইবোন কয়েকজন আছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্কও খুব কম—এক রেখাদিকে বাদ দিলে। রেখাদি মীরার প্রায় সমবয়সী, বছর খানেকের বড়। তার স্বামী

হিমাংশ্ব দারজিলিঙে রয়েছে। মীরার সঙ্গে হিমাংশ্বদের খ্বব খাতির। র্ব্মাকিকে দারজিলিঙে নিয়ে যাবার ব্যাপারে ওদেরই হাত বেশী। রেখাদিরা কলকাতায় এলে তাদের নিজেদের ছন্নছাড়া বাড়িতে বড় একটা উঠতে চায় না, মীরার কাছেই ওঠে। তা উঠ্বক—প্রমথর কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু মীরা তার নিজের খ্বশিতে তো অনেককেই এ-বাড়িতে রাজসমাদরে রেখে দিয়েছে। যেমন নিরঞ্জন বলে এক ছোকরাকে গত বছরই দশ পনেরো দিন রেখেছিল মীরা, ছোকরা নাকি ডুয়ার্সের কোন চা-বাগানের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার। প্রমথ সবে চিকেন পক্স থেকে উঠেছে নিরঞ্জন এল। দারজিলিংঙের জামাইবাব্বর চেনাজানা। মীরাকে তখন সব সময়ই টগবগ দেখাত।

এ-ছাড়া কম করেও পাঁচ সাত জনকে মনে করতে পারে প্রমথ—নামধাম সমেত, যারা মীরার আমন্ত্রিত, বন্ধ্বর আত্মীয়, মার অম্বকের তম্বক, মীরার নিজেরই পরিচিত। এদের মধ্যে সকলেই যে উ'চু দরের লোক তাও নয়, সিনেমার গল্প লেখে অমরেশ বলে একজনকেও মীরা দ্ব চারদিন রেখেছিল।

প্রমথ এ-সব নিকে কথা বলতে চাইত না। বিয়ের পর থেকেই মীরা বেশ স্বচ্ছন্দে তার পছন্দসই লোককে বাড়িতে সমাদরে ডাকত এবং রাখত। তার বাপের বাড়িতে নাকি এসব ছিল। তা থাকুক। শ্বশ্বরকে প্রমথ দেখে নি; শ্বনেছে ভদ্রলোক দিলদরিয়া ছিলেন, মারা যাবার পর ব্যবসাও দরিয়ায় ডুবল। মা যখন এসে কাছে ছিল মাসখানেক তখন মীরার সঙ্গে প্রমথর কিছ্ব কথা কাটাকাটি হয়েছে। মীরা শাশ্বড়ীকে পছন্দ করত না। ভাবত, এ-রকম গে'য়ো, দীন, বর্ণপরিচয়হীন একজন মহিলাকে শাশ্বড়ী বলে মেনে নেওয়াও লজ্জার। মা বেচারী দ্বঃখী মান্বষ, শান্তভাবেই সব কিছ্ব দেখে নিয়ে একদিন নিজের জায়গায় ফিরে গেল। প্রমথর বড় লেগেছিল।

কিন্তু এ-সব কথা ভেবে কি লাভ? প্রমথ জীবনে অনেকবার ঝ'্বকি নিয়েছে। কখনও কখনও ঝ'্বকি লেগেও গিয়েছে। চাকরিতেই যেমন। সে কোনোদিন এতটা প্রত্যাশা করে নি। ভগবান তাকে দিয়ে দিয়েছেন—সে হাত পেতে নিয়েছে। বিয়েটাও সেই রকম। অফিসের এক ম্বর্ব্বি, বড় ম্বর্ব্বি নয়, তব্ব ম্বর্ব্বি—দিবাকর চ্যাটার্জি—ঝপ করে একদিন প্রমথকে বলল, 'জানা-শোনা একটি মেয়ে আছে—খ্ববই স্বন্দরী—বিয়ে করবে?'

প্রমথ তখন চাকরি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত; ছোটাছ্বটি করতে করতে জীবন যাচ্ছে। বিয়ে করার সাধ থাকলেও পাত্রী খোঁজার অবসর ছিল না। কথাটা সে ঠাট্টা হিসেবেই নিয়েছিল। মীরাকে দেখার পর প্রমথর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না—ওই মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই—তখন সে মীরার পাশে বেমানান ছিল। আবার মনে মনে প্রমথর টান ছিল স্বন্দরীর ওপর। তা বলে এতটা স্বন্দরী সে আশা করে নি।

প্রমথ এখানেও ঝুঁকি নিল। বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর প্রমথ স্ত্রীর কাছেই সব কিছু সমর্পণ করল। তার ব্যক্তিত্বটুকুও। সেটা আর ফিরে পেল না।

সাবানের ফেনা শুকিয়ে চড়চড় করে উঠতেই প্রমথ বেসিনের কল খুলে দিল। জল বেশ ঠাণ্ডা। বার বার চোখে ঝাপটা দিতে লাগল।

সুরপতি প্রমথর বন্ধু। যদি প্রমথ তাকে আমন্ত্রণ করে থাকে—এ-বাড়িতে থাকার অধিকার তার আছে। মীরা না করতে পারে না। সংসারে যা কিছু হবে সবই কি মীরার পছন্দে!

প্রমথ ঘাড়ের চারপাশে জল দিতে লাগল। সুরপতিকে সে রাখবে।

সাত

প্রমথ বলল, "তোর ব্যাপারটা এবার বল।"

সুরপতি চুপ করেই থাকল। বন্ধুকে সে অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ করছে. অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর পর প্রমথকে যেমন দেখাচ্ছিল এখন আর তেমন দেখাচ্ছে না। চোখেমুখে কোথাও ময়লার ভাব নেই। ক্লান্তির স্পষ্ট রেখা-গুলিও মুছে গেছে। ঘরোয়া, ঢিলেঢালা দেখাচ্ছিল তাকে। তবু সুরপতির মনে হচ্ছিল, প্রমথর উৎফুল্ল এবং উচ্ছ্বাসিত ভাবটা যেন সামান্য কম।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। প্রমথ খাওয়া-দাওয়া ভালবাসে। মীরা আজ স্বামীর জন্যে তেমন করে কিছু করতে পারেনি। প্রমথও যেন পছন্দসই কিছু পেল না, কিছু খেল—কিছু পড়ে থাকল।

চা শেষ করে সিগারেট ধরাল প্রমথ, হাত পা ছড়িয়ে দিল তারপর সুর-পতিকে বলল, "তোর ব্যাপারটা এবার বল?"

সুরপতি প্রথমে কোনো জবাব দিল না। পরে বলল, "সকালের কথা বলছিস?"

মাথা নাড়িয়ে প্রমথ জানাল, সকালের কথাই সে জানতে চাইছে।

সুরপতি হাসির মুখ করল। "ব্যাপার তেমন কিছু নয়। ব্যারাকপুরে ফিরে যাব ভেবেছিলাম। কাল ফেরা হল না। যে বাড়িতে থাকি সে-বাড়ির বুড়ি আবার ভাববে-টাববে। আমার একটা কাজও ছিল বাড়িতে।"

"বাঃ" প্রমথ অভিযোগের মুখ করে বলল, "বুড়ি ভাববে—! আর তুই কাউকে কিছু না জানিয়ে এ-বাড়ি থেকে চলে গেলে আমরা ভাবব না?"

সুরপতি অনেকটা ত্রুটি স্বীকারের মতন করে বলল, "তোরা ঘুমোচ্ছিলি। তোদের কাজ করার মেয়েটিও বাড়িতে ছিল না। কাউকে দেখতে পেলে নিশ্চয় বলে যেতাম, গাড়িটাও ছিল সকালে।"

প্রমথ খুশী হল না। সুরপতির এ-ধরনের যুক্তি ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়। বলল, "তুই কি আমাকে গাধা ভাবিস?"

সুরপতি হাসল। "কেন?"

"ভোর বেলায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে ব্যারাকপুরের ট্রেন ধরা যদি এতই জরুরী হত—তুই ট্রেন ধরতিস। বলবি, ট্রেন মিস করেছিস। আরও তো গাড়ি ছিল, তুই গেলি না কেন? কেন তুই দুপুর পর্যন্ত কলকাতায় ঘুরে বেড়ালি?"

সুরপতি জানত, স্বাভাবিক এই প্রশ্নগুলো প্রমথ তাকে করতেই পারে। জবাব দেবার মতন কিছু তার নেই, যা আছে—প্রমথকে তা বলাও যাবে না। শুধু প্রমথকে কেন—নিজেকেও সুরপতি ঠিক মত বোঝাতে পারছিল না, কেন সে ফিরে এসেছে? দু'চারটে সাজানো গোছানো কথা সুরপতি ঠিক করে রেখেছিল, প্রমথকে বলতে পারত—, কিন্তু তাতেও যে বন্ধুকে সন্তুষ্ট করা যেত সুরপতির তা মনে হল না।

সামান্য চুপ করে থেকে সুরপতি কুণ্ঠার গলায় বলল, "তোর কাছে মাফ চাইছি। আমার অন্যায় হয়েছে।"

প্রমথ সন্তুষ্ট হল না। সুরপতি যেভাবে তার অন্যায় মেনে নিচ্ছে—তাতে তাকে খুঁচিয়ে কিছু জানতেও তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। অথচ তার কৌতূহল থাকল। ছাদের দিকে মুখ তুলে বার দুই সিগারেটে টান দিল প্রমথ। মুখ পুরোপুরি না নামিয়েই বলল, "তোর কি এখানে থাকতে কোনো অসুবিধে হয়েছিল কাল?"

"না", সুরপতি বলল, মাথা নাড়ল, "না—।"

প্রমথ মুখ নামাল। বন্ধুর দিকে তাকাল। চোখে সামান্য দ্বিধা। "আমি ভাবছিলাম—আমার কালকের ব্যাপারে মীরা হয়ত তোকে কিছু বলেছে। তুই লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিস।"

সুরপতি এবারও মাথা নাড়ল। "তোর বউ আমায় কিছু বলেনি।"

কথাটা প্রমথ ভাল করে শোনবার আগেই আবার বলল, "মীরা মাতলামি-টাতলামি পছন্দ করে না। দু চারবার আমি বেশ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। দেখেছি, মীরা বেজায় খেপে গেছে। আসলে কোনো বউই বাড়িতে এসব হইহট্ট সহ্য করতে পারে না—বুঝলি সুরপতি। এ একেবারে মেয়েদের স্বভাব। তবে আমি কাল তেমন কিছু করিনি। করেছি? মাতলামি করেছিলাম?"

সুরপতি হাসিমুখে বলল, "না, একটু বেশী বকবক করছিলি।"

'তা হলে মীরার মেজাজ খারাপ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।' বলে প্রমথ চুপ করে গেল হঠাৎ। সিগারেটে টান দিল। তারপর একেবারে আচমকা সুরপতিকে জিজ্ঞেস করল, "মীরা তোকে কিছু বলে নি তো? মানে তার কোনো ব্যবহারে তুই..."

সুরপতি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না, না। তুই অকারণ খুঁতখুঁত করছিস।"

প্রমথ কয়েক মুহূর্ত বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকল। সুরপতিকে ক্ষুণ্ণ অথবা বিব্রত দেখাচ্ছে না। খুশী হল প্রমথ। মীরা সুরপতিকে নিশ্চয় এমন কিছু বলে নি বা তার ব্যবহারে এমন কিছুই প্রকাশ পায়নি যাতে সুরপতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। প্রমথ অনেকটা স্বস্তি পেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার খেয়াল

হল, সুরপতি যদি কোনো কারণে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে—তবে সে আবার এ-বাড়িতে ফিরে আসবে কেন?

সিগারেটটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে প্রমথ এবার আরাম করে বসল, সোফায় প তুলে। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল "তোর বুকে ব্যথার কথা কী বলছিলি তখন?"

সুরপতি বাঁ হাতটা বুকের কাছে আলগোছে তুলে আনল। "দুপুরে ব্যথাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। এখন ভাল আছি।"

"তুই কাল বলছিলি হার্টের একটা গোলমাল আছে!"

"ডাক্তাররা তাই মনে করে।"

প্রমথ সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রের মধ্যে ফেলে দিল। বলল, "কলকাতায় কাউকে দেখিয়েছিস?"

"না।"

"দেখানো উচিত ছিল। তুই কলকাতায় এসেছিস দু তিনমাস। এতোদিন কী করছিলি?"

সুরপতি বলল, হাসিমুখেই, "গা করিনি।"

"করা উচিত ছিল। আফটার অল হার্টের ব্যাপার। ইন ফ্যাক্ট সকালে যখন তুই বেপাত্তা -আমার তো ভয়ই হচ্ছিল, কোথাও শালা মুখ থুবড়ে পড়ে আছিস কিনা।"

সুরপতি প্রমথকে এতোক্ষণে সহজ হয়ে আসতে দেখল। প্রমথ তার স্বভাব মতন চনমনে হয়ে আসছে যেন। প্রমথকে লক্ষ করতে করতে সুরপতি হেসে বলল, "একদিন তো পড়তেই হবে।"

প্রমথ শুনল না। কুশন টেনে নিয়ে সোফার একপাশে রাখল, হেলে বসল। "তুই একজন বড় ডাক্তার দেখা।—স্পেশ্যালিস্ট।" একটু থামল, "হার্টের ব্যাপার ফেলে রাখা ভাল নয়। দিস ইজ সিরিআস। আমাদের অফিসের একজন অ্যাকাউন্টটেন্ট, হার্ডলি ফিফটি হবে কি হবে না, অফিসে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ বলল, শরীরটা খারাপ লাগছে। লোকে ভাবল, গ্যাসট্যাস হয়েছে, হাতের কাছে যা পেল খাওয়াল, মিনিট পনেরো বিশের মধ্যেই ফিনিশ। হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া গেল না।"

সুরপতি শুনছিল কি শুনছিল না—বোঝা গেল না।

প্রমথ বলল, "আমার ডাক্তার আছে, মানে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান নয়—এক কলিগের মামাশ্বশুর নাম করা কার্ডিওলজিস্ট, চল তোকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই, যত্ন করে দেখে দেবেন।" নাকের ডগা চুলকে নিল প্রমথ। "আমার একবার, বুঝলি সুরপতি, বুকের কাছটায় চিনচিনে একটা ব্যথা হচ্ছিল। মীরাকে বলি নি। কোলিগের সঙ্গে চলে গেলাম বুক দেখাতে। ভদ্রলোক বেশ যত্ন

করে দেখলেন। তারপর ঠাট্টা করে বুকে এক ঘুঁষি মেরে বললেন—কিস্যু হয় নি মশাই, আপনার হার্ট ডবল ডেকার বাসের চেয়েও তেজী রয়েছে। যান, খান দান ঘুমোন—মজায় থাকুন, সিগারেট একটু কম খাবেন—মাঝে মাঝে চোরা অম্বল হলে কিছু একটা অ্যান্টাসিড খেয়ে নেবেন। ব্যাস—তারপর থেকে আমি ফ্রি। কিচ্ছু ভাবি না।"

সুরপতি এবার দু হাত দু পাশে ছড়িয়ে দিয়ে বসল। প্রমথর মুখ আরও স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তার মনে হল, প্রমথ কথা বলতে ভালবাসে। কথা বলতে এবং নিজের সঙ্গে লুকোচুরি না করে নিজেকে প্রকাশ করতে তার ভাল লাগে। এ-রকম মনে হওয়া সত্ত্বেও সুরপতির সন্দেহ হল, প্রমথ লুকোচুরি চায় না—অথচ তাকে করতে হয়।

"তুই আমার সঙ্গে চল", প্রমথ বলল।

"কী হবে", সুরপতি গায়ে না মেখে বলল, "ডাক্তার দেখালেই ভয় আরও বাড়বে।"

"তুই শালা গেঁয়ো মানুষের মতন কথা বলছিস। ডাক্তার দেখাবি না—তো কি একদিন মুখ থুবড়ে পড়ে মরবি?"

"যদি কপালে থাকে—।"

"তাহলে মর।" প্রমথ বেশ নিশ্চিত গলায় বলল। বলে আবার সিগারেট ধরাল একটা। "তোর হার্টের অসুখটা কত দিনের?"

সুরপতি না ভেবেই বলল, "অনেক দিনের।"

"অনেক দিনের? মানে?"

সুরপতি প্রমথর দিকে তাকাল। প্রমথ তাকে দেখছে। সুরপতি বলল, "বেনারস থেকেই।"

সুরপতির এই উদাসীনতা বা অবহেলা প্রমথর পছন্দ হল না। নিতান্ত নির্বোধ না হলে এমন কাজ কেউ করে না। প্রমথ স্বাভাবিক উদ্বেগ এবং কিছুটা অভিভাবকের সতর্কবাণীর মতন করে বলল, "অনেকদিন ধরে তুই ওটা পুষে রেখেছিস? রাখ, পুষে রাখ—; ও যে কী কালসাপ তা তো শালা জান না? যখন ছোবল খাবি, বুঝবি! সত্যি সুরপতি, তুই একটা গাড়োল।"

সুরপতি কথা বলল না। তার এই ব্যথাটা পুরোনো। কত পুরোনো বোঝা মুশকিল। কখনও কখনও সুরপতি নিজেই বোঝবার চেষ্টা করেছে, ঠিক কখন থেকে এই ব্যথা তার শুরু হয়েছে? নির্দিষ্ট করে সে কিছুই খুঁজে পায় নি। জীবনের সমস্ত ব্যথার উৎপত্তি কোথায়, কেমন করে—মানুষ কি তা খুঁজে পায়? সুরপতির মনে হয়েছে, আমরা অনেক কিছুর উৎসই খুঁজে পাই না। ব্যাধির নয়, বেদনারও নয়; সুখেরও নয় দুঃখেরও নয়। এও এক রহস্য।

তবু সুরপতি অনেক হাতড়ে হাতড়ে দু একটি স্মৃতিকে উদ্ধার করতে পারে যখন এই ধরনের বা এর কাছাকাছি কোনো ব্যথা সে অনুভব করেছে। যেমন রমা মারা যাবার পর, যেমন শ্যামার কাছ থেকে চোরের মতন পালিয়ে আসার পর।

রমা মারা যাবার দৃশ্য যেন সুরপতি আচমকা দেখতে পেল। ঘন কুয়াশার মধ্যে কোনো অস্পষ্ট কিছু দাঁড়িয়ে আছে—এইভাবে সেই স্মৃতি দূরান্তে দাঁড়িয়ে থাকল, কয়েক মুহূর্ত, তারপর সহসা স্পষ্ট হল। সুরপতি দেখল, গোধুলিয়ার সেই দোতলা বাড়ির রমার ঘরে সে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের দিকে খোলা দরজা, দরজার গা-লাগানো বারান্দার আগাগোড়া লোহার জাল দিয়ে ঘেরা, কতককালের পুরোনো এক অশ্বত্থ গাছের ডালপালার একটা পাশ বারান্দার গায়ে এসে পড়েছে। শীতকাল। রোদ উঠেছে সবে। রমা তার ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে, কোমর পর্যন্ত লেপ ঢাকা, বুকের দিকটা আগোছালো, বালিশের একপাশে মাথা সামান্য হেলে রয়েছে। রমার মুখের প্রায় সবটাই নীল দাগে ভরা, দেখলে মনে হয়—কালসিটে পড়ে আছে। শ্যামা বিছানার একপাশে বসে, শুকনো অথচ নিস্পৃহ মুখ। একটা মাছি বার বার রমার মুখের কাছে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

সুরপতি রমার কাছে কোন অপরাধ করে নি। রমা সুরপতিকে কোনোদিন বুঝতে দেয় নি—তার সমস্ত আবরণের মধ্যে সতর্কভাবে সে কিছু রেখেছিল যা সুরপতির প্রাপ্য। রমা তার গায়ের চামড়া, হাত পা মুখ সর্বাঙ্গ, ক্রমশ নীল হয়ে আসা, আর সেই বর্ণ-পরিবর্তন গোপন রাখার জন্যে এত বেশী সতর্ক ও বিব্রত থাকত যে তার হৃদয় বা মনের দিকে সাহস করে নজর দিত না। রমা নিজের এই অস্বাভাবিক ব্যাধিকে লুকোবার চেষ্টা করে করে হাল ছেড়ে দিয়ে-ছিল—বুঝেছিল তার আর কিছুই করার নেই, হয় ওই নীলচে দৃষ্টিকটু গায়ের রঙ নিয়ে বাইরে আসা—না হয় আত্মহত্যা করা। রমা শেষেরটা করেছিল, কেননা নিজের শরীরের এই বাইরের বিকৃতি সে সহ্য করতে পারে নি।

সুরপতি জানে না, সেদিন—সেই শীতের সকালে রমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন করে যেন তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল। আচমকা তার কপালে ঘাম জমছিল, শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তবু সুর-পতি রমার মুখের ওপর থেকে মাছিটা তাড়াবার জন্যে দু পা এগিয়ে যেতেই শ্যামা বলল, 'তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।'

সুরপতি শ্যামার দিকে তাকাল। শ্যামা হাত বাড়িয়ে লেপটা রমার কোমর থেকে টেনে বুকের কাছে উঠিয়ে দিচ্ছিল।

সুরপতি বাইরে এসে দাঁড়াল। বারান্দায়। সারা বারান্দা জালি দিয়ে ঢাকা। অশ্বত্থ গাছে বাতাস লেগেছে শীতের। দু চারটে শুকনো বিবর্ণ পাতা

ঝরে পড়ছে। নীচের রাস্তা দিয়ে একদল তীর্থযাত্রী গঙ্গাস্নানে চলেছে। বাঙালী। এক বুড়ি শিবস্তোত্র পাঠ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুরপতি আকাশের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। অনুভব করল তার বুক যেন ব্যথায় ভেঙে যাচ্ছে। সে-ব্যথা যে কী প্রবল আর গভীর তা প্রকাশ করা যায় না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় শ্যামা সুরপতিকে বলল, 'তুমি কি এখন বেড়াল ছানার মতন কেঁদে বেড়াবে?'

সুরপতি কথাটা বুঝতে পারে নি; অবাক চোখ করে তাকিয়ে থাকল।

শ্যামা বলল, 'দিদির চিতায় জল দেবার সময় তুমি অনেক কেঁদেছ। আর কেঁদে লাভ কী!'

সুরপতি বলল, 'যদি কাঁদি—তুমি বুঝবে কি করে?'

শ্যামা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তোমায় না বুঝলে ভগবানও তোমায় বুঝবে না। তোমায় আমি চিনি। দিদি বেঁচে থাকতেও তুমি তার শোবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে পার নি। সে তোমায় কোনো দিনই দাঁড়াতে দিত না। নিজেকে ঢেকে ঢেকেই তার জীবন কেটেছে। যাক্‌গে, শোনো, দিদি তোমায় কাঁধে করে বয়ে কিংবা হাত ধরে টেনে এ-বাড়িতে আনে নি। আমি তোমায় এনেছিলাম। আমি ছাড়া তোমার গতি ছিল না, নেই।'

সুরপতি শ্যামার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। শ্যামা বরাবরই বেপরোয়া, কোনো কিছুই গ্রাহ্য করে না। তার সবটাই যেন আমিত্ব দিয়ে গড়া। শ্যামাকে সেদিন নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, হীন মনে হয়েছিল সুরপতির। ভয়ও পেয়েছিল।

আরও কিছুদিন পরে শ্যামা যেদিন রমার শূন্য খাটে, তার ফাঁকা ঘরে সুরপতির শয্যা পেতে দিল, আর পাশের ঘরে নিজে থাকল—সেদিন সুরপতি বুঝতে পেরেছিল—শ্যামা সুরপতিকে পাকাপাকিভাবে কিনে নিতে চাইছে।

'আমি তো বেশ ছিলাম—' সুরপতি তার আপত্তি জানিয়েছিল।

শ্যামা বলল, 'তুমি এ ঘরেও বেশ থাকবে। মিছিমিছি দোতলার তিন চারটে ঘর জুড়ে থেকে লাভ কী? সিঁড়ির সামনের দিকের ওই দেড়খানা ঘর আমি ভাড়া দিয়ে দিয়েছি।

'ভাড়া দিয়ে দিয়েছ? কাকে?'

'শ্রীবাস্তবকে। ও ওর কবিরাজী ওষুধের মালপত্র রাখবে।'

'আমায় কিছু বললে না?'

'কি হত বলে! দিদি চলে গিয়ে আয় তো বাড়ে নি, কমেছে। সংসার চালাতে পয়সা লাগে। বাড়তি ঘর ফেলে রেখে আমাদের কি লাভ? এ তবু মাসে মাসে শ'খানেক টাকা আসবে।'

সুরপতি কথা বলতে পারে নি। মাসিমা মারা যাবার পর ডিসপেনসারির অংশ মেয়েরা বেচে দিয়েছিল। দুই বোন আর সুরপতির আয়ে সংসার

চলত। রমা মারা যাবার পর থাকল দু'জনের আয়। শ্যামার আয় খারাপ ছিল না, আর সুরপতি কাজ করত গণেশজীর ফার্মে। ভাড়া না দিয়েও দু'জনের চলে যাবার কথা। শ্যামা তবু সামনের দিকটা ছেড়ে দিল, দিয়ে তার শোবার ঘরের পাশে—দিদির শোবার ঘরে সুরপতিকে টেনে আনল। সুরপতি বুঝতে পারছিল, শ্যামার সঙ্গে তার সম্পর্ক বিপজ্জনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সুরপতি নীতিবাগিশ নয়, তার কোনো সংস্কারও ছিল না, শ্যামার সঙ্গে স্থায়ীভাবে জীবন কাটানোয় তার বিবেকও যে কাতর হত তাও নয়, কিন্তু শ্যামার সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে সুরপতির ইচ্ছে ছিল না। শ্যামা এমন এক জাতের মেয়ে যার কাছে ভালবাসার অর্থ ছিল অধিকার। শ্যামা এখানে অকুণ্ঠ ছিল, অসঙ্কোচ ছিল। সুরপতির সঙ্গে শ্যামার কখনও কখনও কথা কাটাকাটি হয়েছে, রাগারাগি; সুরপতি প্রায় সব সময়েই লক্ষ করেছে—শ্যামাকে সে কখনও মাথা নিচু করাতে পারে নি। নিজেকে জিতিয়ে নেবার সব রকম উপায় শ্যামার জানা ছিল, সুরপতি যা জানত না।

বেনারস ছেড়ে পালাবার জন্য সুরপতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শ্যামাকে তখন প্রচণ্ড ভয় হত তার, ভয় আর ভাবনা।

শ্যামা সবই ধরতে পেরেছিল। একদিন সুরপতিকে বলল, 'তুমি এখান থেকে পালাতে চাইছ?'

সুরপতি বলল, 'এখানে আমার ভাল লাগছে না।'

'তোমার ভাল লাগা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। তুমি ভেব না, তোমার মতন পুরুষমানুষকে আটকে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। ইচ্ছে করলে তোমায় আমি ফ্যাসাদে ফেলতে পারি। তুমি আমাদের বাড়ির অনেক নুন খেয়েছ; আমার কাছে পাও নি—এমন কিছু নেই; তবু তুমি এত অকৃতজ্ঞ কেমন ক'রে হলে?'

সুরপতি লুকোচুরি না করেই বলল, 'অকৃতজ্ঞ কেন, তুমি আমায় আরও অনেক কিছু বলতে পার। তবে, একটা কথা বলি—আমায় তোমার পুরুষমানুষ করে রেখে তোমার আর লাভ হবে না।'

এইভাবে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে শেষে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়াল যখন শ্যামা মাথার ঠিক রাখতে পারল না। তার হাতের কাছে কাচের গ্লাস ছিল, ছুঁড়ে মারল সুরপতিকে। সুরপতি মুখ বাঁচাবার জন্যে ঘাড় ফেরাতেই গ্লাসটা এসে তার মাথার পিছন দিকে—পাশ ঘেঁষে লাগল। ভেঙে গেল গ্লাসটা, কাচে মাথা কেটে গেল।

মারাত্মক কিছু হয়নি, তবু ডিসপেনসারিতে গিয়ে মাথায় ওষুধপত্র দিয়ে আসতে হল। রাত্রে সামান্য জ্বর বাড়ল। মাঝ রাত কিংবা শেষ রাতে ঘুম

ভেঙে জ্বর এবং বেদনার অস্বস্তির মধ্যে সুরপতি অনুভব করল, শ্যামা তাকে শিশুর মতন আঁকড়ে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে। শ্যামার মুখের গন্ধ, তার মাথার চুলের রুক্ষ মাটি মাটি ঘ্রাণ, তার হাতের প্রবল চাপ, বুকের উষ্ণতা অনুভব করার সময় সুরপতি আবার সেই ব্যথা অনুভব করতে পারল। বুকের তলায় কি-যেন মুচড়ে উঠছিল, কেমন একটা চোরা বাতাস সমস্ত বুকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। ক্রমশই সেই ব্যথা তীব্র হল, অসহ্য হয়ে আসতে লাগল। সুরপতি শ্বাসকষ্ট অনুভব করছিল। রমা মারা যাবার দিন ঠিক এই ব্যথা সে অনুভব করেছিল, নাকি এর কাছাকাছি কোনো ব্যথা—তা বোঝা গেল না। সব ব্যথার অনুভবই বোধ হয় এক নয়, কখনো কখনো তবু একই রকম মনে হয়।

শ্যামার আলিঙ্গন সুরপতিকে কষ্ট দিচ্ছিল। ওর হাত সরিয়ে দেবার সময় সুরপতি ঘামতে শুরু করেছিল। তার কপাল, হাত, বুক ভিজে যাচ্ছিল।

শ্যামা বিরক্ত হয়ে আধো-ঘুমে বলল, 'কী হচ্ছে?'

সুরপতি বলল, 'আমার কষ্ট হচ্ছে, আমায় জড়িয়ো না।

পরের দিন সকালে সুরপতি আবার যখন ডাক্তারখানায় গেল তার মাথার ক্ষত ভাল করে দিনের আলোয় দেখতে দেখতে ডাক্তারবাবু বললেন, 'সুর পতিবাবু খুব শান্তশিষ্ট ছেলে ছিলেন দেখছি। মাথায় এত বড় কাটা দাগ কিসের? মাথা ফাটিয়ে ছিলেন নাকি?'

সুরপতির মনে পড়ল, দোলের দিন একটা ছেলে রঙের বালতি তার মাথায় মেরেছিল। কেটে গিয়েছিল অনেকটা। ক'দিন বেশ ভুগিয়েছিল।

প্রমথ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। সুরপতি বোবার মতন বসে এত কী ভাবছে তার মাথায় এল না। অপেক্ষা করতে করতে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বিরক্ত হয়ে বলল, "কিরে, তোর হল কী?"

সুরপতি হুঁশ ফিরে পেল। নিঃশ্বাস ফেলে তাকাল প্রমথর দিকে।

"কিছু বলছিলি?" সুরপতি জিগ্যেস করল।

প্রমথ বলল, "তুই কি থেকে থেকে মূর্ছা যাস নাকি? বলছিলাম—পুরোনো বুকের ব্যথা বয়ে নিয়ে কতদিন বেঁচে থাকবি? ও জিনিস পুষে রাখা ভাল নয়। আমার সঙ্গে চল—ভাল ডাক্তার দেখিয়ে দি। ব্যাপারটা বোঝা যাবে।"

সুরপতি বিষণ্ণ মুখে হাসল। বলল, "সব ব্যাপার খোলাখুলি বুঝতে নেই, রে। তাতে আরও বিপদ হয়।" বলে সামান্য থেমে সুরপতি আবার বলল, "শোন, আমাকে কাল একবার ব্যারাকপুর যেতেই হবে। দু দিন বাড়ি ফেরা হল না। আমার বুড়ি ভাবছে—আমি বোধ হয় মরেই গেলাম। থানা পুলিসও করতে পারে।"

"তুই কাল বিকেলেই আবার চলে আয়।"

"এখানে?"

"বাঃ, এখানে বই কি! এখানে থাকবি। তোকে ক'দিন থাকতেই হবে।" প্রমথ জোর দিয়ে বলল। "পুরোনো বন্ধুবান্ধবকে খবর দি। ত্রিদিবকে কালই ফোন করব। অনেকদিন পরে একটা হুল্লোড় হবে, বুঝলি সুরপতি। আমরা মরে যাচ্ছি, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। মাঝে সাঝে একটা নাড়া লাগা চাই। দেখতে চাই, শালা যৌবন কি ভ্যানিশ হয়ে গেল, না, এক আধ ফোঁটা আছে এখনও।" বলে প্রমথ হাসতে লাগল।

আট

মীরাকে আজ আর মশারি টাঙাতে হল না; সুবপতি নিজেই টাঙিয়ে নিল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা দৃষ্টিকটু দেখায় বলেই হয়ত মীরা ঝুলন্ত মশারির ধারগুলো বিছানার পাশে গুঁজে দিচ্ছিল।

মীরার কাজ শেষ হলে সুরপতি বলল, "কাল সকালে চা খেয়ে আমি বেরিয়ে যাব। দুপুরে ফিরব না।"

তাকাল মীরা। সুরপতি কথা শেষ করে নি; তার মুখে অসমাপ্ত কথার বিরতি, আবার কিছু বলবে। কোনো রকম ব্যগ্রতা দেখাল না মীরা তবু তার চোখে সামান্য কৌতূহল থাকল।

সুরপতি বলল, "যদি ফিরে আসি, আসতে আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

মীরা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। সুরপতির চোখে চোখে তাকাতে তার আর ভাল লাগছে না। অস্বস্তি হচ্ছে। বিকেলের পর থেকে এই মানুষ-টার সঙ্গে মেলামেশা করা বা স্বাভাবিকভাবে, বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে, সাধারণ কথাবার্তা বলাও মীরার পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। সারাটা সন্ধ্যে মীরা সুরপতিকে এড়িয়ে গিয়েছে, খাবার টেবিলে যতটা সম্ভব তফাত থাকার চেষ্টাই করেছে সে। প্রমথ খাবার টেবিলে বন্ধুকে মুখোমুখি বসিয়ে স্ত্রীর মন গলা-বার চেষ্টা করেছিল। মীরা প্রায় চুপচাপ পরিবেশন করে গিয়েছে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু চারটে কথা ছাড়া কিছু বলে নি, আগাগোড়া ওদের সামনে বসে বা দাঁড়িয়েও থাকে নি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে দু বন্ধু আর বাইরের ঘরে গেল না। সুরপতির জন্যে ছেড়ে দেওয়া ঘরটায় এসে বসল। গল্পগুজব করতে করতে সিগারেট টানছিল। মীরা তার হাতের কাজকর্ম গুছিয়ে খেতে বসল। রাধা না থাকায় সব কিছু সারতে তার দেরিই হল খানিকটা। প্রমথ হাই তুলতে তুলতে শোবার ঘরে চলে গেল। আরও খানিকটা পরে মীরা সুরপতির ঘরে এসেছিল। এসে দেখল, চুপচাপ বসে আছে সুরপতি।

মীরা যেন কাজ সারতে এসেছে এইভাবে মশারি টাঙাতে যাচ্ছিল, সুরপতি বসেছিল, নিজেই উঠে গিয়ে সে মশারি টেনে নিল। বলল, আমায় দিন— আমি টাঙাচ্ছি।

মশারি টাঙানো হয়ে গেছে, মীরার আর দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই।

তবু সুরপতির কথায় সে দাঁড়াল।

সুরপতি আবার বলল, "প্রমথ শুয়ে পড়েছে?"

মীরা অন্যদিকে তাকিয়েই মাথা হেলিয়ে দিল সামান্য।

"বসুন না", সুরপতি বেতের চেয়ারটা হাত দিয়ে দেখাল।

মাথা নাড়ল মীরা। "রাত হয়ে গেছে।"

"খুব রাত নয়, একটু বসুন।" সুরপতি যেন মীরাকে বসাবার জন্যে দু পা এগিয়ে বেতের চেয়ারটা এগিয়ে দিল।

বসবে কি বসবে না করে মীরা দাঁড়িয়ে থাকল, সুরপতিকে এক পলক দেখল।

সুরপতি মৃদু গলায় আবার বলল, "বসুন।"

মীরা বসল। যেন বসতে বাধ্য হল। সুরপতির গলায় এমন এক সুর ছিল যা মামুলি অনুরোধ নয়।

মীরাকে গভীর চোখে দেখল সুরপতি। বলল, "আমাকে আপনি চিনতে পারবেন এমন আশা আমি করি না। তবু ঘটনাটা মনে থাকার মতন। তাই না?" সুরপতির বলার ধরন থেকে মনে হচ্ছিল, মীরা তাকে চিনেছে এ-ব্যাপারে সে প্রায় নিঃসন্দেহ। মীরা নিরুত্তাপ থাকল।

সুরপতি সামান্য সময় নীরব থাকল। তারপর আচমকা বলল, "ওর কী হল?"

মীরা তাকাল। বুঝতে পারল না। তবু তার চোখে কেমন সন্দেহ। "কার?"

"সেই ছেলেটির?"

মীরা চমকাল না, কিন্তু বিহ্বল বোধ করল। মুখে ঈষৎ বিবর্ণতা লক্ষ করা গেলেও তার চোখ দুটি হঠাৎ যেন কেমন অস্থির দেখাল।

সুরপতি অপেক্ষা করে বলল, "আমারও ভাল করে তাকে মনে পড়ছে না, কালো চেহারা, ছিপছিপে..."

মীরা কথার মধ্যে বলল, "আমারও মনে পড়ছে না।"

সুরপতি হাসল না, স্বাভাবিকভাবেই বলল, "আপনাদের বাড়িতে ছিল।"

মীরা বিরক্ত বোধ করল। ওই মানুষটা তার ওপর জবরদস্তি করার চেষ্টা করছে নাকি? কী ভেবেছে সে মীরাকে? মুখ তুলে চোখ রুক্ষ করে মীরা বলল, "আমাদের বাড়িতে অনেকেই ছিল, অনেকেই থাকত, সকলকে আমার মনে নেই।"

সুরপতি শান্তভাবে বলল, "আমার খুব অবাক লাগছে।" বলে ম্লান করে হাসল, "আমার মাথার জখমের কথা বাদ দিন, কিন্তু ওর জন্যে আপনার হাত যেভাবে কেটেছিল তাতে দু একটা আঙুল নষ্ট হয়ে যেতে পারত বরা-

বরের জন্যে। তবু তাকে মনে নেই আপনার?"

নিজের মধ্যে শীত লাগার মতন কাঁপুনি অনুভব করল মীরা। হাত পায়ে কাঁটা দিচ্ছে না, থরথর করে সে কাঁপছে না, অথচ কেমন এক শিহরণ, যা অনেকটা চাপা ভয়ের মতন, লুকোনো জ্বরের গ্লানির মতন, মীরাকে বিপন্ন করছিল। কয়েক মুহূর্ত ভাবল মীরা, তারপর যেন কোনো কিছু গ্রাহ্য না করেই বলল, "সব কিছু আমি মনে রাখি না। আমার নিজের দোষেই হাত কেটেছিল।"

সুরপতি স্থির চোখে মীরাকে দেখছিল। আজ যেন মীরা প্রসাধনই করে নি, মাথায় খোঁপা নেই, এলো চুল কোনো রকমে জড়ানো পরনে হাতে-ছাপা হালকা রঙের শাড়ি, নীল ফুলের ছাপ সারা গায়ে ছড়ানো, গলা-বুকের খানিকটা গরদ রঙের সুতীর চাদরে ঢাকা।

সুরপতি বলল, "নিজের দোষে কাটে নি।"

"আপনি জানেন?"

"আমি জানি। আমরা সবই জানতাম। অনেক কথা রটেছিল। আমরা তখন অনেক কিছু দেখেছি।"

মীরা রেগে উঠছিল। রেগে গিয়ে কিছু বলতেও তার আটকাল। মাথা গরম করে কতটা লাভ হবে বুঝতে না পেরে সে সতর্ক হবার চেটা করল। চাপা গলায় বলল, "আমি আপনার মাথায় মেরেছিলাম নাকি?"

"না, না।"

"তা হলে এ কথা কেন তুলছেন?"

"আমি আপনার সেই ছেলেটির কথা জিজ্ঞেস করছি।"

'আপনার ছেলেটি'—কথাটা মীরার কান এড়াল না। রুক্ষস্বরে মীরা বলল, "আমি জানি না। আমাদের বাড়িতে সে আর আসত না, কলকাতার বাড়ির কথা বলছি।"

"কি যেন নাম ছিল?"

"নীলেন্দু।"

সুরপতি অন্যমনস্ক চোখে কিছু ভাবল। হয়ত মনে করার চেষ্টা করল। তারপর বলল, "নামটা তাই হবে। আপনার সঙ্গে খুব ভাব ছিল ওর।"

মীরার আর বসে থাকতে সাহস হচ্ছিল না। সুরপতি তাকে কোণঠাসা করে ফেলার চেষ্টা করছে। কেন এমন করছে, কী তার উদ্দেশ্য—মীরা কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে একটা জিনিস সে ধরতে পেরেছে, আজ দুপুরেই নিঃসন্দেহ হয়েছে। সুরপতি বন্ধুর মুখ চেয়ে এ বাড়িতে ফিরে আসে নি, মীরার জন্যেই এসেছে। কিন্তু কেন?

মীরা আর বসে থাকতে চাইল না। প্রমথ আজ নেশাটেশা করে নি।

হয়ত সে এখনও ঘুমোয় নি—শুয়ে আছে, অপেক্ষা করছে মীরার।

কোনো রকম ভূমিকা না করেই মীরা উঠে পড়ল। বলল, "আমি শুতে যাচ্ছি। কাল সকালে সকাল উঠব। আপনি চা খেয়ে যেতে পারবেন।"

আর দাঁড়াল না মীরা, পলকের জন্যে সুরপতিকে একবার দেখে নিয়েই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাতি নিবিয়ে বিছনায় শোবার আগেই মীরা বুঝতে পেরেছিল, প্রমথ ঘুমোয় নি। শুয়ে পড়ে হালকা লেপটা বুকের কাছাকাছি টেনে নিল। মাথার বালিশটা ঠিক করল। চোখ বুজল না। অন্ধকারে শুয়ে শুয়েই বুক এবং কোমরের বাঁধনগুলো সামান্য আলগা করল। নিজের শরীরকে এই বয়সে হালকা রাখা মুশকিল। তবু গড়নের জন্যে এবং ধাতের দরুন মীরা খানিকটা হালকা রাখতে পেরেছে। বছর দুয়েক আগে সে বেশ ফুলতে শুরু করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মাস-হিসেবের ওষুধ আর অন্য পাঁচটা ব্যাপারে এমন সাবধান হয়ে গেল যে, বাড়াবাড়ি ধরনের মেদ আর জমতে দিল না শরীরে। এখনও মীরা তার সেই খুঁতখুঁতে ভাবটা বজায় রেখেছে। যতই সাবধানে থাকুক—বয়েসের নিজের একটা উথলোনো ভাব আছে—সেই টানে মীরার শরীর নিশ্চয় কিছু ভারী। অন্য সময় তেমন না হলেও শোবার সময় মীরা যেন সেটা বুঝতে পারে—অনুভব করতে পারে—তার দামী নীচের জামা আর ব্লাউজের আঁট ভাবটা বুক চেপে ধরেছে। কোমরের তলার দিকেও এই রকম একটা অস্বস্তি হয়, পেটের গড়ানো জায়গাটা ভারী লাগে। ঢিলেঢালা না হয়ে সে শুতে পারে না, ঘুম আসতে চায় না।

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে মীরা ছাদের দিকে চেয়ে থাকল। এই ঘরের একটা সুবিধে—রাস্তার কোনো আলো ঘরে আসে না। আশপাশের বাড়িরও নয়। বাতি নেবালেই সব অন্ধকার। জানলার কাঠের পাল্লা ভেজানো থাকলে একেবারে থমথমে কালো হয়ে যায় পুরো ঘরটাই।

প্রমথ জেগেছিল বলে একটু নড়াচড়া করল। প্রথমে সোজা হল, তার পর মীরার দিকে পাশ ফিরল। তার লেপ আলাদা। ভারি লেপ ছাড়া প্রমথর আবার আরাম হয় না। মীরা স্বামীকে ভারী লেপ দিয়েছে, নিজে হালকা লেপ নিয়েছে। এখনকার এই মরা শীতে প্রমথকে ভারী লেপ টেনে শুতে দেখলে মীরার কেমন গা ঘিনঘিন করে।

অন্ধকারে অবশ্যই কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু মীরা বুঝতে পারছিল, প্রমথ জেগে আছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে প্রমথ তার একটা হাত আলতো করে স্ত্রীর গায়ে রাখল। অফিস থেকে ফিরে আসার পর মীরাকে সে খুশী দেখে নি। তার

পর সারাক্ষণই যখনই সুযোগ এসেছে প্রমথ স্ত্রীকে নজর করে বুঝেছে—মীরার মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। খাবার সময় স্ত্রীকে খানিকটা তোয়াজের চেষ্টা করেছিল প্রমথ, কোনো লাভ হয় নি। এখন বিছানায় শুয়ে—অন্ধকারে সে স্ত্রীকে বোধ হয় প্রসন্ন করার ভূমিকা করছিল।

মীরা চুপচাপ থাকল। স্বামীর হাত টেনেও নিল না, সরিয়েও দিল না।

প্রমথ কিছুক্ষণ স্ত্রীর মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করল। মীরার সঙ্গে এত বছর একই শয্যায় শুয়ে থাকতে থাকতে স্ত্রীর প্রায় প্রত্যেকটি নড়াচড়া ও আচরণের মধ্যে থেকে স্ত্রীর মনের গতি সে বুঝতে পারে। মীরা প্রসন্ন থাকলে একরকম, মীরা আগ্রহী থাকলে এক রকম, অতি-ইচ্ছুক বা একেবারেই অনিচ্ছুক থাকলে অন্য রকম এবং মীরা অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ থাকলে একেবারেই অন্য ধরনের আচরণ করে। যেমন, মীরা যেদিন স্বামীসঙ্গের জন্যে অতিরিক্ত কাতর থাকে সেদিন বিছানায় এসে বসার পর অন্ধকারে সে যে গলার হার খুলে বালিশের তলায় রাখছে, মাথার খোঁপা খুলে ফেলছে, শব্দ করছে চুড়িতে, গায়ের বসনটসন শিথিল এবং কিছু কিছু মুক্ত করছে—শুয়ে শুয়ে প্রমথ তা বুঝতে পারে। এসব সময় মীরা শুয়ে পড়ার আগেই তার মাথার বালিশটা খানিকটা লঘুভাবে, খানিকটা যেন রাগের ভান করে প্রমথর বালিশের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে, ফেলেই বেশ শব্দ করে—অগোছালোভাবে স্বামীর গায়ে গায়ে শুয়ে পড়ে। শুয়েই এমন করে প্রমথর গায়ের ওপর তার ভারী উরু সমেত পুরো পা তুলে দেয় যে প্রমথ সর্বাঙ্গে নারীসঙ্গের তাপ অনুভব করে। আজ অবশ্য মীরা স্বামীসঙ্গ চাইছে না।

প্রমথ বুঝতে পারছিল, বেশী রকম বিরক্ত থাকলে মীরা স্বামীর হাত গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিত। অন্তত শব্দ করত বিরক্তির—তার পর অন্য-দিকে ফিরে শুয়ে পড়ত।

আরও একটু অপেক্ষা করে প্রমথ বলল, "রাধা নেই, তোমার ভোগান্তি হল খুব।"

মীরা সাড়া দিল না। প্রমথ যেমন মীরাকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুঝতে পারে, মীরাও স্বামীকে সেই রকম বোঝে। হয়ত আরও বেশী বোঝে।

প্রমথ যে মীরার মন রাখার চেষ্টা করছে, আরও করবে—মীরার বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না। কিন্তু প্রমথকে নিয়ে মীরা ভাবছিল না, সুরপতির কথাই ভাবছিল। ভাবনা সুরপতির বলেই মীরা এমন কিছু করছিল না যাতে স্বামী তাকে বিরক্ত করে। উপেক্ষার মতনই স্বামীর হাত সে গ্রহণ বা বর্জন করল না।

"কাল সকালে আমি মানিককে বলে দেব গ্যাসের দোকানে খবর দিয়ে দেবে।" প্রমথ ঘরোয়া গলায় বলল। সে বলতে পারত, আমি খবর দিয়ে

দেব। বলল না, কেননা প্রমথ যখন অফিস যায় গ্যাসের দোকান খোলে না। মানিক নামের একটা ছেলে আছে পাড়ায়, বেগার খাটে, প্রয়োজনে দু এক টাকা পায়, প্রমথকে খাতিরটাতির করে। মানিককে বলে দিলে গ্যাসের দোকানে যাওয়া এবং গ্যাস আনার ব্যবস্থাটা সে করে দিতে পারবে।

মীরা তবু সাড়াশব্দ করল না। প্রমথ মীরার হাতের আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

"সকালের দুধটা রাধার বোনকে আনতে দিয়ে দিও", প্রমথ বলল, যেন মীরার গেরস্থালি কাজকর্মের সুবিধেগুলো সে বলে দিচ্ছে।

মীরা কান করছিল না। সুরপতিকে সে এখনও বুঝতে পারছে না। লোকটার মাথায় কী রয়েছে বোঝা মুশকিল। এল, গেল। আবার এল। কাল যাবে; আবার ফিরে আসবে বলেই মনে হচ্ছে মীরার। কেন আসবে? মীরার কাছে কী চায় ও?

"তুমি কি ঘুমোচ্ছ?" প্রমথ বলল, সে জানে মীরা ঘুমোয় নি।

"না।"

"চুপচাপ রয়েছো?"

"এমনি। ঘুম পাচ্ছে।"

"দুপুরে আজ শোও নি?"

জবাব দিল না মীরা। প্রমথ স্ত্রীকে আরও সোহাগ দেখাবার চেষ্টা করছে, হাত ছেড়ে দিয়েছে মীরার, দিয়ে কাঁধের কাছে চাপ দিচ্ছে। প্রমথর স্পর্শ থেকে মীরা অনুভব করতে পারছিল স্বাভাবিক কোমলতা প্রকাশের আগ্রহ ছাড়া প্রমথর অন্য কিছুতে রুচি নেই।

অল্প-সময় চুপচাপ থাকল মীরা। শব্দ করে হাই তুলল। বলল "পরশু দিন আমি থাকব না।"

"থাকবে না?"

"মার কাছে যাব। পরশু শনিবার।"

প্রমথর মনে পড়ল, শনিবার মীরার দক্ষিণেশ্বর যাবার কথা। মীরার মা ছোট ভাই অন্তু দক্ষিণেশ্বরে থাকে। গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি কোন যুগে ছেড়ে দিয়ে ওরা দুচার বছর এখানে ওখানে কাটিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চলে গেছে। মীরার মার চেষ্টায় বাড়িঘরও করতে পেরেছে ছোটখাট করে। অন্তু বেশ কাজের ছেলে। সে নাকি তার বাবার মতন ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও বৈষয়িক বুদ্ধি পেয়েছে। প্রমথ পছন্দই করে শালাকে। অন্তুর বউ—কল্পনাও ভাল। দেখতে অপরূপ কিছু নয়, কিন্তু গুণী মেয়ে; গানটান গেয়ে নাম করেছে, মাঝে মাঝে রেডিয়োতে তার গলা শোনা যায়। অন্তুদের বাচ্চাকাচ্চা হয় নি। একটা গোলমাল রয়েছে কল্পনার। বাচ্চা হবার বয়েস পড়ে আছে অনেক; হয়ে

যেতেও পারে। মীরার মা যদি নিজের ছোট ছেলের বাচ্চাকাচ্চাকে কাছে পেত—হয়ত মেয়ের ছেলেকে এভাবে দখল করে রাখত না।

"ঝণ্টু একটা বাচ্চাদের সাইকেল চেয়েছিল", প্রমথ বলল, "সাইকেল কাঁধে করে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া ঝামেলার। দেখি, পরে যখন যাব—নিয়ে যাব।"

মীরা ঝণ্টুর সাইকেলের জন্যে ব্যস্ত হল না। কথাটা সে অন্য কারণে প্রমথকে মনে করিয়ে দিতে চাইছিল। মীরা বলল, "আমি পরশু দিন সকালের দিকেই বেরিয়ে যাব—তুমি অফিস যাবার পর, রাত্তিরে ফিরতেও পারি, নাও পারি। তুমি তো তোমার বন্ধুকে কালই ফিরে আসতে বলেছ!"

প্রমথ এবার বুঝতে পারল। তার খেয়ালই ছিল না, শনিবার দিন মীরার মার কাছে যাবার কথা। সকালে মীরা বলেছিল। প্রমথ যেতে পারবে না যে তাও জানিয়ে দিয়েছে।

প্রমথ যেন কোনো ভুল করে ফেলেছে এইভাবে বলল, "আমার মনে ছিল না।..তা তুমি যদি সকালের দিকে বেরিয়ে যাও—রাধা থাকবে।"

"কোথায় রাধা?"

"দেখো না, কাল হয়ত এসে পড়তে পারে।"

"যদি না আসে—"

"যদি না আসে—না আসে—" প্রমথ ভাবতে ভাবতে বলল, "তা হলে বিপদ। কিন্তু তুমি রাত্তিরে ফিরবে না কেন?"

"মা আসতে দিতে চায় না", মীরা এবার অন্যদিকে পাশ ফিরে গেল, "তুমি যাবে না। মা বলবে—একলা একলা এতদূর ফিবে যাবি আবার—থেকে যা-কাল সকালে যাস।"

প্রমথ বলল, "মাকে বলো, বাড়িতে রাধা নেই। তুমি সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে এস। পারলে ঝণ্টুকে নিয়ে এস। সুরপতি একবার দেখুক। আমার একটা ছেলেমেয়েকেও সে দেখে নি।"

মীরা বিরক্ত বোধ করল। বলল, "বাজে কথা বলো না তো! তুমি নিজে বসে বসে পা নাড়বে—আর আমি তোমার বন্ধুকে তোমার ছেলে দেখানোর জন্যে এতটা পথ বয়ে আনব, আবার ফেরত দিয়ে আসব! তোমার শখ থাকে তুমি নিয়ে আস গে যাও।"

প্রমথ কিছু বলতে যাচ্ছিল—মীরা কথা বলতে দিল না। বরং রাগের গলাতেই বলল, সে যদি ফিরতে না পারে একদিন প্রমথ কেন তা মেনে নেবে না? এটা নতুন কিছু নয়, এমন অনেক সময়ই হয়েছে—মীরা তার মার কাছে চলে গিয়েছে, রাত্রে ফেরেনি, প্রমথকে রাধাই দেখাশোনা করেছে, কোনো অসুবিধে তার হয়নি। সুরপতি এসে এ-বাড়িতে থাকবে বলে প্রমথর এত ঘ্যানঘ্যান করার কি আছে! মীরার তো ইচ্ছেই নয়, সুরপতি আসুক।

এতটা রাত্রে প্রমথ স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির মধ্যে গেল না। মীরাকে তুষ্ট করতেই চেয়েছিল সে, ফল অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে দেখে আর কথা বাড়াল না, সকালের জন্যে ব্যাপারটা তুলে রেখে চোখ বুজল।

মীরা ঘুমলো না। চুপচাপ একইভাবে শুয়ে থাকল। রাত বেড়ে যাওয়ায় শীত অনুভব করা যাচ্ছে। গলা পর্যন্ত লেপ টেনে পাশ ফিরে মীরা শুয়েই থাকল। প্রমথ ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে তার নিঃশ্বাসের ভারী শব্দ কানে আসছিল।

জীবনে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে, আর আশ্চর্য হবার মতন কিছু ঘটলেই যে মানুষ আকাশ-পাতাল ভাবতে বসে তা নয়। মীরা অন্তত বসবে না। সে-স্বভাব তার নয়। তার এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের জীবনে অসংখ্যবার দেখেছে—যা সে কখনও ভাবেনি, প্রত্যাশাও করেনি তাই ঘটে গেছে। সুর-পতির আবির্ভাবে তার আশ্চর্য হবার মতন কোনো কারণ থাকতে পারে না। এমন তো হতেই পারে—এই কলকাতা শহরেই অনেকে আছে যারা ছেলেবেলায় মীরাদের চিনত জানত, আজ এত বছর পরে আবার কোথাও তাদের কারও কারও সঙ্গে মীরার দেখা হয়ে গেল! হয়েছে যে তার প্রমাণও মীরার কাছে আছে। প্রমথর এক অফিসের বন্ধুর বোনের বিয়েতে মীরা তার ছেলেবেলার সঙ্গী চুয়াকে দেখতে পেল, দুজনেই দুজনকে দেখে অবাক। মীরাদের তাল-তলার পাশের বাড়িতে থাকত চুয়ারা। একবার সন্তুর এক বন্ধু মীরাকে সিনেমা হাউসের মধ্যেই কেমন চমকে দিয়েছিল। কাজে কাজেই সুরপতির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় মীরার সত্যি সত্যি বিচলিত হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবু সে বিচলিত বোধ করছে! কেন?

কাল যখন প্রমথর সঙ্গে সুরপতি এ-বাড়িতে এল মীরা বাস্তবিকই তাকে চিনতে পারেনি। স্বামীর বন্ধু বাড়িতে এসেছে বলে তার অখুশী হবার কোনো কারণ ছিল না, সে বন্ধুপত্নী হিসেবে প্রমথর পুরনো বন্ধুকে যথাসাধ্য সমাদর দেখাবার চেষ্টাই করেছিল। কোনো রকম অস্বস্তি সে বোধ করেনি। এমন কি সুরপতি যখন মীরার হাতের কাটা দাগটা প্রথম লক্ষ করল, লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল—'ওই দাগটা কিসের?'—তখনও মীরা সহজ এবং স্বাভা-বিক ছিল। সে বুঝতেই পারেনি সুরপতি এই কাটা দাগটার রহস্য জানে। কিন্তু কাল রাত্রে, সুরপতির ঘরে যখন মীরা মশারি টাঙাতে গেল, তখন সুরপতি আবার যখন হাতের দাগটার কথা তুলল এবং বলে দিল—কাচে কেটে-ছিল হাতটা—বুড়ো আঙুলটাই উড়ে যেতে পারত—তখন থেকেই মীরার কেমন সন্দেহ হল লোকটার ওপর। কেমন করে ও জানল? কেমন করে?

কাল রাত্রে মীরার ভাল ঘুম হয়নি। স্বামীর ওপর সে নিশ্চয় খানিকটা

বিরক্ত ছিল, বন্ধুকে কাছে পেয়ে একরাশ মদ গিলে বেহায়াপনা করা তার ভাল লাগেনি; তার ওপর মীরা যখন শুতে এল—তখন তার মাথায় ওই চিন্তাটা ঢুকে গেছে—সুরপতি কে? কেমন করে সে জানল, মীরার হাত কাচে কেটে গিয়েছিল? তার জীবনের এই ঘটনা কে তাকে জানাল?

সুরপতির যে সব গল্প, মানে স্বামীর পুরনো অন্তরঙ্গ বন্ধুদের যে সব গল্পটল্প সে শুনেছে—তার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সে সুরপতিকে খোঁজবার চেষ্টা করল। দু' জনে ঘরে বসে যেসব গল্প করছিল কাল—তার কোনো কোনো কথা যা মীরার কানে গেছে তাও খুঁজে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করল। আব তাব সন্দেহ হল, এই মানুষটাই সেই ছেলে যাকে নীলেন্দু আর একটু হলেই হয়ত খুন করে ফেলত।

মীবা বেশ বুঝতে পারল, বাবার স্বাস্থ্যের জন্যে সপরিবারে তারা যখন হাজারিবাগে গিয়েছিল তাদের ভাড়াটে বাড়ির কাছাকাছি সুরপতিরা থাকত। বাড়িটাব কী নাম ছিল তা অবশ্য মনে নেই মীরাব—তবে 'লক্ষ্মীনিবাস' কিংবা 'অন্নদাভবন' এই রকম কিছু একটা ছিল। ছোট ধবনেব একতলা বাড়ি, পুবনো ঢঙেব, বাড়ির বাইরে সাধাসিধে চুনকাম করা। একটা কুয়া ছিল সামনে। অল্প একটু জায়গায় দু-চারটে গাছগাছালি। বাড়ির কেউ বোধ হয় হাসপাতালেব কম্পাউন্ডার ছিল।

মীবা নিশ্চয় এখানে সুরপতিকে দেখেছে। রাস্তায়, বাজাবে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু সেই দেখা না-দেখার মতন। তাতে কোনো কৌতূহল ছিল না, আগ্রহ ছিল না। তা ছাড়া মীরা অন্যকে লক্ষ করার চেয়ে নিজেকে লক্ষ কবানোতেই ব্যস্ত থাকতো। এই সময় তার জীবনে নীলেন্দু এসে গেল।

নীলেন্দুর সঙ্গে মীরা যে ধরনের ঘোরাফেরা, হাসিগল্প, ঘনিষ্ঠতা শুরু কবেছিল তাতে আর কোন ছেলে তাব দিকে তাকাচ্ছে তা দেখাব বা তাকে নিযে ভাবার কিছু ছিল না।

কিন্তু সেই দোলেব দিন যা ঘটে গেল তারপর মীরা নিজেকে নিয়েও যেমন ছটফট করেছে—সেই রকম ওই ছেলেটির জন্যও তার খারাপ লাগত। অঘটন ঘটার পরের দিন হাসপাতালে সে ছেলেটিকে দেখেছিল, মাথায় ব্যান্ডেজ। তারপব আর দেখেনি। জ্বর, জ্বালা, ব্যথা, হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে এক-এক সময় ছেলেটির কথা তার মনে পড়ত। বেচারী সত্যি সত্যি কোনো বড় দোষ করেনি; ওই দোল খেলার হুজুগে না হয় রঙের বালতিব খানিকটা মীরার গায়ে মাথায় ঢেলে দিয়েছিল—তা বলে নীলেন্দু তাকে পশুর মতন মারতে যাবে? আর একটু বেকায়দায় লাগলে ছেলেটা হয়ত মরেই যেত। এমন খুনে রাগ মানুষেব থাকা উচিত নয়।

কবে, কোন যুগে ঘটে গেছে তা মনে রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

মীরারও মনে ছিল না। জীবনে অনেক কিছু চাপা পড়ে যায়, যা পুরনো তা তলায় জমতে জমতে কখন যেন এত গভীরে হারিয়ে যায়—যা আর উদ্ধার করা যায় না। মীরা তার সদ্য যৌবনের এই ঘটনা—যখন তার মধ্যে চঞ্চলতা ছিল, কৌতূহল ও লোভ ছিল,—যৌবনের বিশৃঙ্খলতা ছিল তার কথা ভুলেই গিয়েছিল। কে বলত পারে, যদি না সকালে নীলেন্দু ওই রকম একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটাত—তা হলে হয়ত নীলেন্দু সেদিন মীরার কাছ থেকে তার প্রাপ্যও পেয়ে যেত। কিন্তু সকালের ঘটনার পর মীরার মন অন্য রকম হয়ে পড়েছিল। নীলেন্দুকে তার ভাল লাগছিল না। নিজেকেই কেমন অপরাধী লাগছিল। আর এই অবস্থায় নীলেন্দু যখন তাকে জোর করে অধিকার করতে চাইছিল—মীরা প্রাণপণে বাধা দিতে গিয়েছিল। তাতেই তার হাত কাটল কাচের ভাঙা শার্সিতে।

খুবই আশ্চর্যের কথা—সুরপতিই শুধু নয় মীরাও সেদিন আহত হয়েছিল। একজন সকালে—অন্য জন সন্ধ্যায়। একজন নিছক কৌতুকের খেলা খেলতে গিয়ে অন্যজন নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে। অঙ্কের হিসেবে দু' জনের আঘাতকে মেলানো যায় না। অথচ কোথায় যেন মিল আছে। কার্য কারণের সম্পর্ক থেকে যাচ্ছে।

সুরপতি এতকাল পরে ফিরে আসবে কে জানত? সে এসেছে। মীরার কাছে তার পরিচয় এখন আর অজ্ঞাত নয়। যাও বা সন্দেহ ছিল মীরার, সমস্ত সন্দেহ সুরপতি দূর করে দিয়েছে। হ্যাঁ—এই সেই মানুষ যে কতকাল আগে মীরার জন্যেই আহত হয়েছিল। মীরার কোনো দোষ ছিল না। নেই। তবু সুরপতি কেন তাকে উৎকণ্ঠিত করছে? কেন তাকে বিরক্ত ও ভীত করছে?

মীরা নিজের বিচলিত ভাব অনুভব করতে পারলেও বুঝতে পারছিল না, সুরপতি কেন চলে গিয়েছিল? কেনই বা ফিরে এল? কি জন্যেই বা অতীতকে মনে করিয়ে দিল?

নয়

সুরপতি জানলাব কাছে বেতের চেয়ার টেনে বসেছিল। কোলের ওপব একটা বই। প্রমথ কোনো কালেই বইটইয়ের তেমন ভক্ত ছিল না। আজও নয়। তবু নিতান্তই সময় কাটাবার জন্যে কিংবা সে যে একেবারেই মুখ্যু, মেঠো নয় সেটা প্রমাণ করতে কখনো সখনো দু চারটে বই চৌরঙ্গিপাড়া থেকে কিনে আনে। তার অফিসের বন্ধুবান্ধবরাও যেসব তাতালো বই পড়ে হাসি তামাশা করে নিজেদের মধ্যে, হাত বদলাতে বদলাতে তার কোনো কোনোটা প্রমথব কাছে চলে আসে। অফিস যাবার সময় প্রমথ দু তিনটে বই বন্ধুর কাছে ফেলে গিয়েছিল। "মীরা থাকবে না, আমারও ফিরতে দেরী হবে, অফিসের একটি ছেলের বাবা আসছে ভেলোর থেকে অপারেশনের পর—সে ধরে নিয়ে যাবে, তুই একা একা বোর ফিল করবি—বইগুলো পড়ে থাকল- সময় কাটাস।"

দুপুরটা কেটে গেছে সুরপতির। বিকেলও কাটল। শীত ফুরিয়ে এসেছে, বসন্তের এই এল-এই এল ভাব, বেলার এই শেষ দিকটা ক্রমশই দীর্ঘ হয়ে আসছে, নয়ত এতোক্ষণে অন্ধকার হয়ে যাবার কথা। সুরপতি জানলার বাইরে মরা ধূসর আলো দেখছিল, কোথাও কাক ডাকছে, অবেলার ডাক, চড়ুইগুলোও ফর ফর করে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় কলিং বেলের শব্দ হল।

রাধা রয়েছে বাড়িতে। কাজকর্ম করছে। সুরপতি উঠল না।

একটু পরেই মীরার গলা পেল সুরপতি। রাধার সঙ্গে কথা বলছে। ঘাড় ঘোরাল সুরপতি। মীরার আজ ফেরার কথা নয়, দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরবে না—এই রকমই কথা ছিল। তা হলে ফিরে এসেছে!

পায়ের শব্দ পেল সুরপতি। মীরা আসছে।

ঘরে এসে দাঁড়াল মীরা। সুরপতিকে দেখল।

সুরপতি ঘুরে বসল। "আপনি ফিরে এলেন?"

মীরা অপ্রতিভ হল না; বলল, "আমার ভাই মাকে নিয়ে বেলুড় যাচ্ছে। বাড়ি সুদ্ধ সবাই। রাত্তিরে ফিরবে। আমায় যেতে বলছিল। কে যায়! ফিরে এলাম।"

সুরপতি যেন কৌতুকের গলায় বলল, "ধর্মকর্মে আপনার মতি নেই?"

"ধর্মকর্ম! ও, আপনি বেলুড় মঠের কথা বলছেন? মা-রা মঠে যাচ্ছে না; বেলুড়ে অন্তুর বড়শালা থাকে, তার বড় মেয়েকে দেখতে আসবে।"

সুরপতি বুঝতে পারল। প্রমথ অফিসে বেরিয়ে যাবার প্রায় সংগে সংগেই মীরা চলে গিয়েছিল, আর ফিরল এই সন্ধ্যের মুখে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করে মীরাকে খানিকটা শুকনো দেখাচ্ছে। ঠিক শীতও নেই, বরং দুপুরের দিকটা গরমই লাগে, রোদের তেজও প্রখর হয়েছে, এই সময়টা বাসেট্রামে ঘোরাঘুরিতে এমনিতেই ক্লান্তি আসার কথা। মীরা হয়ত সেই জন্যেই সামান্য ক্লান্ত, মাথার চুল উসকোখুসকো, কপালে কানে আলগা চুল জড়িয়ে রয়েছে, মুখে সামান্য ঘাম। তবু মীরাকে গোমড়া, বিরক্ত দেখাচ্ছে না, সকালেও যা দেখাচ্ছিল।

"প্রমথ ফেরে নি," সুরপতি বলল। কথার কথা, না বললেও চলত, তবু বলল।

মীরা বলল, "ফিরতে রাত হবে। মৃদুল বলে এক বন্ধু আছে অফিসের, তার বাবাকে আনতে যাবে।"

সুরপতি মাথা নাড়ল একটু; সে শুনেছে।

মীরা বলল, "আপনি বসুন, আমি আসছি।...চা খেয়েছেন?"

"খেয়েছি। রাধা দিয়েছে।"

মীরা আর কথা বলল না। তার চোখের ভাবে বোঝাল, সে পরে আসছে।

সুরপতি আবার জানলার দিকে ঘুরে বসল। আলো আরও ধূসর হয়ে গিয়েছে, অন্ধকার মিশে যাচ্ছে পাতলা করে, এ-পাড়ায় এখনও সব রাস্তায় পিচ পড়েনি, খোয়ার ধুলো মেশানো বাতাসে রুক্ষ গন্ধ, কোথাও একটু গুমোট ভাব উঠছে, আকাশে মেঘ জমেছে কিনা বোঝার উপায় নেই, টুকরো আকাশ-টুকু যা চোখে পড়ে তার কোথাও কোন মেঘ নেই, সন্ধ্যের ময়লাটুকুই যা জমে আসছে।

ব্যারাকপুরে সুরপতির বাড়ির আশেপাশে পোড়া মাঠের অভাব নেই, গাছপালাও যথেষ্ট, ডোবা পুকুর সামনে, কাঁচা নর্দমার পাঁক থেকেও গন্ধও ওঠে। তবু সুরপতি সেখানে ঘরে বসে জানলার বাইরে তাকালে আকাশ দেখতে পায়, একটা বিরাট বট হাত পঞ্চাশ দূরে, পুবে একটা শিমুল গাছ।

সুরপতি যে হুট করে দু রাত্রি বাড়ি ফিরল না তাতে তার বাড়িউলী বুড়ি তারামণি খুব চটে গিয়েছিল। লেখাপড়া শেখা ভদ্দরলোকের এ কেমন ব্যবহার? বুড়ির ভয় হচ্ছিল, সুরপতি বুঝি রেল লাইনে কাটা পড়েছে। এ লাইনে হরদম মানুষ কাটা পড়ে। ডেলি প্যাসেঞ্জারির এই বিপদ। যতক্ষণ না ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে আসছে ততক্ষণ বাড়ির লোকের শান্তি নেই। বুড়ি গিয়ে হরিপদকে ধরল; তার কেমন অস্থির লাগছিল। হরিপদ কোনো উপায়

বাতলাতে পারল না। এত বড় শহর আর শহরতলীতে কে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে—সে কেমন করে বলবে। উমাশশীর ছেলে বাবলুর এক রত্তির ইলেক-ট্রিকের দোকানেও গেল তারামণি। বাবলু নিজে পেটে ছুরি খাবার পর থেকে ধরেই নিয়েছে, কে কবে কোথায় কাকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে—থানা পুলিসেও বলতে পারবে না। উমাশশী অবশ্য সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, সুরপতির মতন জোয়ান মদ্দ মানুষ কি আর সহজেই হারিয়ে যাবে! সে আসবে।

সুরপতি ফিরে গিয়ে তারামণিকে নিশ্চিন্ত করল। বলল, এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতেই এই বিপদ। সে ছাড়ল না।

ব্যারাকপুর থেকে এবার আসবার সময় সুরপতি একটা কিট্ ব্যাগ গুছিয়ে এনেছে, তারামণিকে বলে এসেছে ভাবনা না করতে, দিন কয়েক পরে সে ফিরবে।

ব্যারাকপুরের চিন্তাটা সুরপতির এখন আর নেই। পাঁচ সাত দিন প্রমথর বাড়িতে থেকে গেলেও কেউ ভাববে না। কিন্তু সুরপতি নিজেই জানে না, সে কদিন এ-বাড়িতে থাকবে।

ছায়া ক্রমশই গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, ঘরের দেওয়াল থেকেও যেন অন্ধকার নামছে।

মীরার কথাই মনে আসছিল সুরপতির। দক্ষিণেশ্বর থেকে আজ তার ফেরার কথা নয়। সকালেও প্রমথ চায়ের টেবিলে মীরাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল। মীরা বোঝে নি। সাধারণ গার্হস্থ্য সৌজন্যের দিক থেকে মীরার অবশ্য ফিরে আসাই উচিত, কিন্তু মীরা সে-সৌজন্য দেখাতে রাজী হয়নি। সুরপতি এ-বাড়িতে রয়েছে এটা স্পষ্ট উপেক্ষা করা যায় না বলেই মীরা ওপর ওপর একটা পোশাকী ভদ্রতা বজায় রেখে যাচ্ছিল। সুরপতিকে সে পছন্দ করছে না। তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নয়—সুরপতি এ-বাড়িতে থাকুক। মীরার আচরণ থেকে সবই স্পষ্ট করে বুঝছিল সুরপতি। আজ দক্ষিণেশ্বর থেকে না এলে মীরা স্বামীর বন্ধুর প্রতি তার উপেক্ষা আরও খোলাখুলি বোঝাতে পারত। মীরা তো তাই ভেবেছিল। ঠিকও করেছিল। তাহলে ফিরে এল কেন?

সুরপতি এটাও লক্ষ করেছে, মীরা বাড়িতে ফিরে এসে এমন ভাবে তার খোঁজ নিতে এল যেন এটা তার কর্তব্য। স্বামীর বন্ধুর প্রতি—অতিথির প্রতি—মীরা কি কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠল? সুরপতি মনে মনে অবাক হচ্ছিল।

অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে সুরপতি উঠে পড়ে বাতি জ্বালিয়ে দিল। মীরার গলা পাওয়া যাচ্ছে আবার। কথা বলছে রাধার সঙ্গে। কেমন যেন হালকা গলা। সামান্য চঞ্চল।

আর খানিকটা পর মীরা এল। বলল, "চা আনছি। এ ঘরেই বসবেন

না, বাইরে?”

এ ঘরে কোনো অসুবিধে বোধ করছিল না সুরপতি, তবু একই ঘরে প্রায় সারাটা দিন বসে থাকার একঘেয়েমির চেয়ে বাইরের ঘরটাই পছন্দ হল; বলল, “বাইরের ঘরেই যাই।”

“আসুন। এই ঘরটার জানলাগুলো বরং ভেজিয়ে দিক রাধা। মশা ঢুকছে।”

“আমিই দিচ্ছি—” লঘু গলায় সুরপতি বলল।

মীরা চলে গেল।

সুরপতি জানলাগুলো ভেজিয়ে দিয়ে তার সিগারেট দেশলাইয়ের জন্যে বিছানার দিকে তাকাল।

বসার ঘরে এসে সুরপতি বসল না, পায়চারি করার মতন সামান্য ঘোরা-ফেরা করল। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সরে গিয়ে বিষ্টুপুরী ঘোড়া দেখল, রেডিয়োগ্রামের মাথার ওপর বসিয়ে রাখা মোষের শিংয়ের এক-পা-তোলা বকটা হাতে তুলে নিয়ে আবার রেখে দিল।

মীরা এল। নিজেই ছোট ট্রের ওপর চা চিনি দুধ বয়ে নিয়ে এসেছে। একটা ছোট প্লেটে কিছু নোনতা বিস্কিট। সুরপতি বসল। মীরাকে দেখল।

মীরা বাইরে থেকে ঘুরে এসে গা ধুয়েছে, চুলটুল পরিষ্কার করে নিয়েছে। শাড়ি জামা পালটে তাকে সতেজ দেখাচ্ছিল। মাথায় খোঁপা নেই, লম্বা বেণী ঝুলছে। চোখ মুখ ধবধবে, পাউডার থাকলেও চোখে পড়ছে না, চোখে কাজল, কপালে সবুজ টিপ। কচি সবুজ শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে টিপ পরেছে।

মীরা কোমর নুইয়ে চা ঢালছিল। সুরপতি কৌতূহলের সঙ্গে মীরাকে লক্ষ করছিল। আজ সকালেও মীরাকে এ-রকম ঘরোয়া দেখায় নি।

“নিন, চা নিন—” মীরা সুরপতিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল যত্ন করে। “বিস্কিট রয়েছে।”

চা নিল সুরপতি। মীরা নিজের চায়ে দুধ চিনি মেশাতে লাগল।

সুরপতি কোনো কথা বলল না। মীরাকে গভীর করে দেখছিল। শাড়ির আঁচলটা এমন করে নামানো যে মীরার পুরো হাতই দেখা যাচ্ছে। লম্বা, ভরন্ত হাত; পুষ্ট অথচ মসৃণ। গায়ের লোমকূপগুলোও ঈষৎ সোনালী রোমে ভরা, মীরার রোম সামান্য ঘন ও দীর্ঘ।

সোজা হয়ে বসল মীরা। তাকাল। দুজনে ঠিক মুখোমুখি হয়ে বসে নেই, সামান্য পাশ হয়ে বসেছে। মীরা ছোট সোফায়, সুরপতি বড়টায়।

“বিস্কিট নিন”, মীরা আবার বলল।

সুরপতি দুটো বিস্কিট নিল। মীরা চায়ের কাপ মুখের কাছে তুলল না,

বুকের কাছে এনে অন্যমনস্ক চোখে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না, সুরপতি বিস্কিট মুখে রেখে চায়ে চুমুক দিল। তাকাল মীরা। তার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ কেমন সতর্ক হয়ে উঠল। সুরপতিকে লক্ষ করতে লাগল সাবধানে।

প্রমথর ফিরতে ফিরতে কত রাত হবে? সুরপতি জিজ্ঞেস করল। দু জনে চুপচাপ বসে থাকার অস্বস্তি কাটাবার জন্যেই।

"কেমন করে বলব রাত হবে মনে হয়। মৃদুলের বাবাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই কি ফিরবে! গল্পটল্প করবে।"

সুরপতি আস্তে আস্তে চা খেতে লাগল। মীরা যত্ন করে চা করেছে। এই যত্ন এবং সদালাপের পেছনে মীরার কী উদ্দেশ্য আছে বোঝা যাচ্ছে না। ও কি সুরপতির জন্যে ফিরে এসেছে? আতিথ্যের দায়িত্ব পালন করতে? নাকি অন্য কারণে?

"আপনার ছেলের খবর কী?" সুরপতি সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করল।

"ভালই আছে।"

"আপনারা গেলে আসতে চায় না?"

"কোথায় চায়! বরং আমাদের দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায় ছেলের, লুকিয়ে থাকে।"

সুরপতি এবার আরও স্পষ্ট করে হাসল। "এরপর তো আপনাদের সঙ্গে ওর আর বনিবনাও হবে না।"

"এখনই হচ্ছে না তো পরে!"

সুরপতি নিজের কথা ভাবল। সে পিতৃহীন ছিল না। তার বাবা মারা গিয়েছেন সুরপতির কৈশোর-শেষে। বাবা বেঁচে থাকতেও সুরপতি কাকার কাছে মানুষ, কাকা আর কাকিমা। মা বাবা অনেকটা দূরে থাকতেন। মধ্য-প্রদেশে। ঠাকুমা থাকত কাকার কাছে। সুরপতি বাবা-মাকে ভাল করে চিনতেই পারল না। কাকা-কাকিমাই তার সব ছিল। বাবা মারা যাবার পর মা কাকার সংসারে এসেছিল। কাকার বাড়িতে নানা রকম অশান্তি করে বাঁকুড়ায় মার গুরুদেবের আশ্রমে চলে গেল। সেখানেই মারা যায়।

মীরা হঠাৎ কথা বলল। "আপনাদের বাড়িটার কী নাম ছিল?"

"বাড়ি? কোন বাড়ি?"

"হাজারিবাগের বাড়ি?"

"ও! . .ওটা আমাদের বাড়ি নয়। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। আমরা মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম। থাকতাম।"

"হাসপাতালের এক কম্পাউন্ডার থাকতেন না ওই বাড়িতে?"

"হ্যাঁ, আমাদের সেই আত্মীয়. বড়দা বলতাম।" সুরপতি বলল, বলে

একটু থেমে হেসে হেসেই আবার বলল, "আপনার তো সবই মনে আছে।"

মীরা তাকিয়ে থাকল। সুরপতি তাকে ঠাট্টা করছে নাকি? "সব নেই, একটু আধটু আছে—" মীরা বলল, "লোকে বলত কম্পাউণ্ডারের বাড়ি। হাস-পাতালেও দেখেছি। দু একবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন। বাবার কাছে।"

সুরপতি চায়ের কাপ রেখে দিল! "মনে করতে চাইলে অনেক কিছু মনে পড়ে—" সুরপতি হালকা করে বলল, "আমার মনে আছে। আপনার বাবাকেও। ভাল কথা, আপনার মা কেমন আছেন? ভাইরা?"

মীরা বুঝতে পারল সুরপতি তাকে অবিশ্বাস করছে। রাগ করার কারণ থাকলেও মীরা রাগ করল না। সে ভেবে দেখেছে, এখানে রাগ করে লাভ নেই। সুরপতির মতিগতি সে বুঝতে পারছে না—লোকটাকে নজরে রাখাই ভাল। মীরা বলল, "ওরা ভালই আছে। অন্তুকে আপনার মনে আছে?"

সুরপতি একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনার দুই ভাই ছিল মনে আছে। তখন দু' জনেই ছোট ছিল। কথাবার্তাও বলেছি। কিন্তু এখন দেখলে চিনতে পারব না।" বলে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকল। সামান্য সময় কোনো সাড়া দিল না কেউ। শেষে সুরপতিই আবার বলল, "আপনাদের বাড়ির কথা আমি প্রমথর মুখে শুনলাম, নয়ত কে অন্তু তাও বুঝতাম না।"

মীরা হাসির ভান করে বলল, "তা হলে একটা কথা বলি?"

"বলুন।"

বলব কি বলব না করে অনেকটা কৌতুকের সুরে, খানিকটা সচেতনভাবেই মীরা বলল, "শুধু আমাকেই মনে আছে—এ কেমন করে হল?"

সুরপতি হাসল না: গম্ভীরও হল না। মীরার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। মীরা উজ্জ্বল অথচ সন্দেহের চোখে তাকে দেখছে। প্রশ্নটা তাকে খুশী করেছে, সুরপতি বলল, "স্মৃতি ওই রকমই।"

মীরা বিস্ময়ের চোখ করল। বলল, "কি রকম?"

"কেউ কেউ কোনো কারণে মনে থেকে যায়। কোনো মানুষ, কোনো ঘটনা। মনকে যা নাড়া দিয়ে যায় তাও মনে থাকে। আপনার জীবনেও এ-রকম নিশ্চয় আছে—যা মনে রেখেছেন।" সুরপতি পকেট হাতড়ে সিগারেট বার করল। দেশলাই। "তখনকার কথাই ধরুন, আমাকে আপনার মনে নেই বলছিলেন। সেই ছেলেটি নীলেন্দুর কথা কিন্তু আপনার মনে আছে। কেন আছে?"

মীরা এ-রকম জবাব প্রত্যাশা করেনি। চমকাল না, অথচ বিপন্ন বোধ করল। সুরপতি ঘুরে ফিরে নীলেন্দুর কথা কেন তুলছে? অসহায়ের মতন চোখ করে তাকিয়ে থাকল। কী বলবে মাথায় আসছিল না। ঢোঁক গিলে মীরা বলল, "আমি কিন্তু একবারও বলিনি সেদিনকার ঘটনাটা আমার

মনে নেই, আমি বলেছিলাম—আপনাকে আমার মনে পড়ছে না।" বলেই যেন আরও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে এক মুহূর্ত থেমে বলল, "আপনিই বলুন—আমি কি কিছু জানতাম! দুম করে বিশ্রী কান্ডটা ঘটে গেল। তখনও আমার মুখ বেয়ে রঙ গড়িয়ে পড়ছে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

সুরপতি সিগারেটটা ধরিয়ে নিল। "ঘটনাটা যত বড় ছিল আমি তত বড় ছিলুম না।"

মীরা কথা বলল না। মানুষ এক-একটা সময় কেমন বিশ্রী ভয় পেয়ে যায়। মীরা সুরপতিকে যেন ভয়ই পাচ্ছে। কেন পাচ্ছে তা সে জানে না।

মীরার মনে হল, সরাসরি সুরপতিকে কথাটা জিজ্ঞেস করে, আপনি এখানে কেন এসেছেন? কী মনে করে থেকে যাচ্ছেন?

মনের এই ব্যাকুলতা মীরা চেপে রাখল। আজ দক্ষিণেশ্বরে মার কাছে যাবার সময়ও মীরা ভেবেছিল সে ফিরে আসবে না। প্রমথর ওপর রাগই শুধু নয়, স্বামীর কাছে সে দেখাতে চাইছিল—সুরপতিকে বাড়িতে রাখার জন্যে সে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। স্বামীর বন্ধু বলেই মীরাকে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকতে হবে নাকি?

দক্ষিণেশ্বর পেৌঁছে মীরার মন কিন্তু জেদী থাকল না। মীরা যদি বাড়ি না ফেরে তা হলে আরও কী হতে পারে ধারণা করতে আতঙ্ক হল। প্রমথকে মোটেই বিশ্বাস নেই তার। বউ বাড়ি নেই দেখে বন্ধুকে নিয়ে মদ গিলবে। এমনিতেই যার প্রাণের কথা কলের জলের মতন মুখ খুললেই গড়িয়ে পড়ে—মদ খেলে তার কত যে প্রাণের কথা পুরোনো বন্ধুর কাছে উথলে পড়বে তার কি শেষ আছে। মীরা জানে প্রমথর কোথায় কোথায় কোন ব্যথা লুকিয়ে আছে। সমস্ত ব্যথাই তার-স্ত্রীর প্রতি অভিমান নয়; আরও চাপা ব্যথা আছে যা প্রমথ প্রকাশ করে না। পুরোনো বন্ধুকে ফাঁকা বাড়িতে পেয়ে মদের ঝোঁকে যদি সব বলতে শুরু করে প্রমথ সেটা যে কত বিশ্রী হবে মীরাই জানে। তা ছাড়া এমনও হতে পারে—বন্ধুর দুঃখে গলে গিয়ে কিংবা শয়তানি করে সুরপতি প্রমথকে মীরার সেই নীলেন্দুর ব্যাপারটা বলে দিতে পারে।

মীরা দক্ষিণেশ্বরে যাবার সময়, সেখানে পেৌঁছে—এই সব এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে রীতিমত অস্থির হয়ে পড়েছিল। মার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা ছিল মামুলিঃ ওই একটু খোঁজ খবর করা, ঝন্টুকে দেখে আসা, অন্তু বাড়ি থাকলে তার আর তার বউয়ের সঙ্গে সামান্য গলপটল্প করা। মীরা কোনো প্রয়োজনের জন্যে মার কাছে যায়নি। ফিরে আসতেও তার আটকাবার কথা নয়। প্রমথর ওপর রাগ করে মীরা দক্ষিণেশ্বরে থাকার কথা বলেছিল, ভেবে দেখল—থাকার চেয়ে না-থাকা ভাল। থাকলে ক্ষতিই হতে পারে।

আসবার সময় মীরা এটা ঠিকই করে নিয়েছিল, সুরপতি কী মতলব নিয়ে এসেছে তা যখন জানাই যাচ্ছে না—তখন বোকার মতন আগ বাড়িয়ে লোকটার সঙ্গে মন কষাকষি করে লাভ নেই। বরং মীরা খানিকটা আলগা হবে; আলগা আর চালাক। সুরপতি যদি ভেবে থাকে সে বেশী বুদ্ধিমান, তবে ভুল করেছে। মীরা একটা পুরুষমানুষকে বশে আনতে পারবে না?

সুরপতির সিগারেট নিবে গিয়েছিল। আবার জ্বালাল।

মীরা হঠাৎ খুব হালকা হয়ে গেল। হাঁটু দুটো ধীরে ধীরে নাড়াতে লাগল। পিঠ আরও এলিয়ে দিল। যেন কত বড় হাসির কথা জিজ্ঞেস করছে—এমন গলায় বলল, "আপনার সঙ্গে আমি মোটেই ঝগড়া করছি না। যাই মনে করুন আপনি, আমার সেদিন কোনো দোষ ছিল না।"

সুরপতি মীরার চোখে চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। "আমি জানি—আপনার দোষ ছিল না।"

"যদি দোষ থাকত—আপনাকে মনে থাকতে পারত হয়ত।"

"আমায় মনে না থাকার জন্যে আপনাকে আমি দুষছি না।"

"আমার তাই মনে হচ্ছে।"

"না না, ওটা ভুল।"

মীরা অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিল। "তা হলে তো কথাই থাকে না।"

সুরপতি কোনো জবাব দিল না।

বসে থাকতে থাকতে মীরা কোলের দিকে কাপড়টা ঠিক করল। তার লম্বা বেণী বুকের দিকে টেনে নিল আলগোছে। আড় চোখে বার দুই সুরপতির মুখ দেখল।

"আচ্ছা—" মীরা হঠাৎ বলল, "আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনি কি বরাবর এ-রকম বাউণ্ডুলে হয়ে কাটাচ্ছেন! আপনার বন্ধুর কাছে শুনলাম—আপনার স্ত্রী রয়েছেন। আপনি ঘর সংসার করেন না?"

সুরপতি অন্যমনস্ক ছিল। একটু যেন অবাক চোখে তাকাল। "আমার স্ত্রী?"

"আছেন তো," মীরা বলল।

সুরপতি সচেতন হল। মীরার চোখের তলায় কৌতূহল না সতর্কতা? সে কি কথার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করছে? সুরপতি বুঝতে পারল না। বলল, "আমার স্ত্রীর কথা কে বলল, প্রমথ?"

"আর কে বলবে!"

সুরপতি মীরার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল না। কিন্তু তার দৃষ্টি অন্যমনস্ক উদাস হয়ে এল। মীরার মুখের ওপর, যেন মীরাকে আড়াল করে বকুলের মুখ ফুটে উঠছিল। সিগারেটটা ফেলে দিল সুরপতি, নিজের সঙ্গে

নিজেই কথা বলছে এমন গলায় বলল, "প্রমথ আমায় জিজ্ঞেস করছিল, আমি বিয়ে করেছি কিনা! বলে ছিলাম—হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর কথা সে আর কিছু জানে না।"

মীরা স্বামীর কাছেও ওইটুকু শুনেছেঃ সুরপতির স্ত্রী ছিল। কিন্তু সেই স্ত্রী কোথায়, বেঁচে আছে না মারা গেছে, সংসার নিয়ে জড়িয়ে রয়েছে কিনা—সে সব সুরপতি কিছু বলেনি।

"আপনি তো বলতে চান না," মীরা বলল। "আপনার বন্ধু বলে, নিজের কথা আপনি কিছুই বলতে চান না।"

সুরপতি মীরার দিকে আর তাকাচ্ছিল না। বকুলকে ভাবছিল।

শ্যামার কাছে যদি সুরপতি নিজেকে ছেড়ে দিত তার ভাগ্যে কী হত সে জানে। শ্যামাদাস হয়ে থাকতে হত কাশীতে, গোধূলিয়ার বাড়িতে জীবনটা কেটে যেত। সুরপতি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বেনারস ছেড়ে পালিয়ে গেল একদিন। কাশীতে থাকার সময় তার এক বন্ধু জুটেছিল গিবিধারীলাল। পাটনায় কাজকারবার করত। সুরপতি এসে গিরিধারীকে ধরল, কিছু রোজ-গারপাতি করতে হবে। সুরপতির নিজের সামান্য সঞ্চয় ছিল, গিরিধারী তাকে কিছু ঋণ দিল। দিয়ে রাঁচির দিকে কাঠের কারবারে লাগিয়ে দিল। সুরপতির ধারণা ছিল না—তার পরিশ্রম ক্ষমতা এবং একাগ্রতা এত বেশী। কাঠের কারবারে সুরপতি দেখতে দেখতে চমৎকার মানিয়ে গেল। বন, জঙ্গল, দাদন, কাঠুরে, রেল-ইয়ার্ডে কাঠের স্তূপ মজুত করা, ওয়াগন বুকিং—সুর-পতি সারা দিন ওই নিয়ে থাকত। এই সময় একদিন বকুলের সঙ্গে তার আলাপ। চামড়াব কারবারী হেম মণ্ডলের বোন।

বকুলের মধ্যে কেমন একটা বন্যতা ছিল, তার গায়েব রঙ ছিল তামাটে, গড়ন ছিল সমর্থ, পরিপুষ্ট। হেম মণ্ডলের ভাঙা দুর্গের মতন বাড়িটার কোথায় চামড়া সেদ্ধ হচ্ছে, কোথায় কত চামড়া গুদোম হচ্ছে—এসব ছিল তার নখদর্পণে। হেম মণ্ডল বেশীর ভাগ সময়টা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত তার বুড়ো অ্যালসেসিয়ানের মতন মটরবাইক নিয়ে। মাথায় সোলার হ্যাট, খাকি জামা আর হাফ প্যান্ট, পায়ে বুট জুতো। চোখে গগলস। গলায় একটা রুপোর ক্রুশ ঝুলত।

বকুলের সঙ্গে সুরপতির প্রেম-ভালোবাসা হয়নি। একদিন হেম মণ্ডল বকুলকে চামড়া সেদ্ধ করার ঘরে পুরে রেখেছিল যে কারণে সেটা অবশ্য সুর-পতি জানে না। কিন্তু যে মুহূর্তে ঘরের দরজা খোলা পেল বকুল সেই মুহূর্তে সোজা সুরপতির বাড়িতে গিয়ে হাজির।

বিয়েটা বকুলই করতে চেয়েছিল। হেম মণ্ডলের কাছে তার জীবনটা চামড়াসেদ্ধর মতন বছরের পর বছর শুধু সেদ্ধই হচ্ছে। একদিন না একদিন

সে ওকে খুন করে ফেলত। যেমন শয়তান লোক হেম মণ্ডল তার সাজাও পেয়েছে সেই রকম। ভগবান তার বউকে কুষ্ঠ দিয়েছে। বাড়ির একপাশে পড়ে থাকে তার বউ।

হেম মণ্ডলের সঙ্গে ঝগড়াঝাটির মধ্যে যাবার ইচ্ছে ছিল না সুরপতির। খেস্টানদের সঙ্গে খুনোখুনি করারও তার আগ্রহ ছিল না। একটা মাঝামাঝি রফা করে সুরপতি বকুলকে বিয়ে করে ফেলল। কেন করল তাও বুঝল না। তার তখন মনে হয়েছিল, একটি মেয়ের সাহচর্য তার প্রয়োজন। শ্যামা সুর-পতিকে এমন একটা নেশা ও অভ্যাসের দাস করে ফেলেছিল যে সুরপতি কখনও কখনও তার জন্যে বড় ব্যাকুলতা বোধ করত। নেশা সুরপতির ছিল, কিন্তু নারীসঙ্গ ছিল না।

বকুলকে বিয়ে করার পর সুরপতি তার কাঠগোলা, তার বাসাবাড়ি অনেকটা তফাতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বকুলকে নিয়ে কিছু সুখশান্তি পাবার চেষ্টাও করেছিল সুরপতি।

মীরা অধৈর্য হয়ে উঠছিল। সুরপতি বোবার মতন বসে আছে দেখে আবার বলল, "আপনার স্ত্রী কোথায়?"

সুরপতি কেমন অর্থহীন চোখে তাকাল।

মীরা বুকের কাছ থেকে বেণীটা আবার পিঠের দিকে সরিয়ে দিল। বলল, "কিছুই বলছেন না?"

"কী বলব!" নিঃশ্বাস ফেলল সুরপতি।

"আপনার স্ত্রীর কথাই বলুন।"

"আমার স্ত্রী কোথায় আমি জানি না। বেঁচে আছে, না মারা গেছে তাও নয়।"

মীরা চোখের পলক ফেলতে পারল না। কী বলছে সুরপতি' মীরার বিশ্বাস হল না। বলল, "কি বলছেন? নিজের স্ত্রী কোথায় তা জানেন না-- তাই কি হয়!"

সুরপতি চুপ করে থেকে বলল, "জানলে বলতুম। জানি না।...তা ছাড়া এটাও তো হয়, আমরা একজন আরেকজনের হাতের কাছে থাকি—তবু জানি না, কে কোথায় আছে।"

মীরা সুরপতির এই হেঁয়ালি বুঝতে পারল না, কিন্তু তার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল।

দশ

রাধার সাড়া পেয়ে মীরা উঠল। ঘরে নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল রাধা। মীরা কিছু বলল না, বাইরে চলে গেল।

সুরপতি রাধার গলা শুনল। মীরার। অস্পষ্ট কথা। ততক্ষণে সে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। রাধা ঘরে এসে চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। সুরপতি দেখল, মনোযোগ দিল না। মাথা তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল—ফাঁকা দৃষ্টি। অনেক দূর দিয়ে মাঠ-ছুঁয়ে ধুলো উড়ে গেলে যেমন দেখায় সেই রকম দেখাচ্ছিল নিজেকে আর বকুলকে।

বকুল যে কোথায় সুরপতি জানে না। সত্যিই তার জানা নেই। কোনো আগ্রহও সে বোধ করে না। বকুল তার স্ত্রী—এটা বোধ হয় ঠিক কথা নয়। এক সময় বকুল তার স্ত্রী হয়েছিল এইমাত্র। মানুষের জীবনের সব কিছু হিসেব মিলিয়ে হয় না, অনেক কিছু ঘটে যেটা হিসেবের বাইরে। হেম মণ্ডলের বাড়ির বকুলকে বিয়ে করাও সেই রকম ঘটনা। সুরপতি নিজের আগ্রহে বকুলকে বিয়ে করতে যায় নি। নিজেই এসেছিল বকুল। প্রেম-ভালোবাসার কোনো ঘটনা ঘটে নি। হেম মণ্ডলের হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে বকুল এসে আশ্রয় চেয়েছিল সুরপতির কাছে। সুরপতিরও তখন ছন্নছাড়া অবস্থা। কাঠের কারবারে গলা ডুবিয়ে বসে আছে; প্রচণ্ড পরিশ্রম, ছোটাছুটি, বিশৃঙ্খল জীবন, গ্যাসট্রাইটিস—শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিল। দিনান্তে নিয়ত মদ্যপান আর উৎকণ্ঠা-জড়ানো নিদ্রা, এই ছিল তার জীবনযাপন। কোনো সন্দেহ নেই সুরপতির ভাগ্য গড়ে উঠছিল কারবারী মানুষ হিসেবে। বকুলকে সুরপতির প্রয়োজন ছিল ঘরোয়া কারণে; আর কোনো কোনোদিন রাত্রে—যখন শ্যামার কাছ থেকে পাওয়া তার সেই প্রবল কামনা ওকে কাতর করত। বকুল ঘরোয়া প্রয়োজনে অচল ছিল। হেম মণ্ডলের বাড়িতে আজীবন যে-মেয়ে জন্তুজানোয়ারের চামড়া ঘেঁটে কাটিয়েছে তার কোনো রকম গার্হস্থ্য-জ্ঞান ছিল না। বকুল ছিল ষোলো আনা অমার্জিত অশিক্ষিত। তার শালীনতা ছিল না, আচরণ ছিল রুক্ষ। বন্য ধরনের, গোঁয়ার, নির্বোধ এই নারী সুরপতির সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত ছিল না। সুরপতি এটাও অনুভব করেছিল, স্ত্রী হিসেবে তাকে শয্যাসঙ্গিনী করাও বিরক্তিকর। বকুল জানত না,

সেখানেও একটা রুচিরক্ষা রয়েছে। কুকুর বেড়ালের মতন মানুষের আচরণ নয়।

কোনো মানুষকেই কারও বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। বকুল শ্যামার বিকল্প নয়। শ্যামা যা দিত তার মধ্যে শুধু শ্যামার দেহ ছিল না; ভালবাসাও ছিল। কিন্তু এই ভালবাসা এত বেশী স্বার্থপর, সর্বগ্রাসী, আত্মময় যে সুরপতির পক্ষে তা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। অধিকার-বোধকে শ্যামা ভালবাসা মনে করত। বকুলের কোনো বোধই ছিল না, ভদ্র জীবনেরও নয়। বছরখানেকের মধ্যে বকুল সুরপতিকে উত্যক্ত করে ফেলল। ভক্তি দাস বলে একটা লোককে দিয়ে হেম মন্ডলের চামড়ার গুদোমে আগুন লাগিয়ে দিল। তাই নিয়ে থানা পুলিস। বকুল সুরপতির কাঠগোলার লোকদের কুৎসিতভাবে গালিগালাজ করত, প্রতিবেশীদের সঙ্গে অশান্তি বাঁধিয়ে রাখত। শেষ পর্যন্ত একদিন বকুল সুরপতিকে কিছু একটা খারাপ নেশার জিনিস খাইয়ে হাজার কয়েক টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। ভক্তি দাসও উধাও।

সুরপতি নিশ্চিন্ত হল। বকুলের জন্যে দুঃখবেদনার কোনো কারণ ছিল না। সে বাঁচল। একেবারে সাধারণ মামুলি সুখ-শান্তি বা সাংসারিক তৃপ্তি পেলেও কথা ছিল না। বকুল কিছু দেয়নি।

এই সময় শ্যামার একটা চিঠি এল। কেমন করে যে শ্যামা সুরপতির খোঁজ পেল বোঝা মুশকিল। বোধ হয় গিরিধারীর কাছে। অবশ্য তখন সুরপতি আর গিরিধারীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি লেখালেখি ছাড়া অন্য সম্পর্ক ছিল না।

শ্যামা সুরপতিকে বেনারসে যেতে লিখেছিল একবার। কোনো জবাব দেয়নি সুরপতি চিঠির।

মাসখানেক পরে শ্যামার দ্বিতীয় চিঠি এল। সে সুরপতির কাছে আসতে চেয়েছে।

সুরপতি ভয় পেয়ে গেল। শ্যামাকে বিশ্বাস নেই। সে এসে পড়তে পারে। সুরপতি এবার চিঠির জবাব দিল। লিখল, তুমি এস না। আমি কাঠের কারবারে মোটা লোকসান খেয়েছি। এই কারবার তুলে অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছে। পারলে আমিই একবার বেনারসে আসব।

শ্যামা আর কোনো চিঠি দেয় নি। সুরপতি ভয়ে ভয়ে থাকল মাস কয়েক। কাঠের কারবারে বাস্তবিকই তেমন কোনো লোকসান সুরপতি দেয় নি। কিন্তু তার আর ভাল লাগছিল না। কারবারী মানুষ হবার জন্যে সে জন্মায় নি। শুধু নিজের কর্মক্ষমতা এবং যোগ্যতা যেন যাচাই করে নিতে চেয়েছিল। একদিন কাঠের কারবার বেচে দিয়ে সুরপতি রাঁচির সীমানা ছেড়ে পালাল।

বকুলকে নিয়ে সুরপতি আর কোনোদিন মাথা ঘামায় নি।

মীরা ঘরে এসেছিল। মীরা আর রাধা।

সুরপতি তাকাল। রাধার কাজকর্ম শেষ হয়েছে। সে চলে যাচ্ছে।

রাধা চলে যাবার পর মীরা দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বসল। সুরপতিকে দেখতে লাগল।

সুরপতি বলল, "প্রমথর কী হল?"

মীরা বলল, "ফিরবে। কোথায় বসে আড্ডা দিচ্ছে! এখনও আটটা বাজে নি।"

সুরপতি মীরার চোখমুখ লক্ষ করল। মীরা গম্ভীর নয়, তবু খানিকটা যেন চিন্তিত।

কিছু সময় চুপচাপ। দুজনেই। মীরা হঠাৎ বলল, "ওর অনেক বন্ধু-বান্ধবকেই দেখলাম। আপনি কেমন আলাদা।"

সুরপতির মুখে মৃদু হাসি এল। "অনেক মানে দু-তিনজনকে দেখেছেন, যারা কলকাতায় থাকে।"

"না, তা কেন হবে! ত্রিদিববাবু—কিংবা অমলবাবুকে প্রায়ই দেখি। ত্রিদিববাবু মাঝে মাঝে আসেন। বাইরে থাকেন রবীনবাবু তিনিও এলাহাবাদ থেকে একবার এসেছিলেন।"

"ত্রিদিব কাল আসতে পারে।"

"আড্ডা জমাতে?" মীরা হেসে বলল।

"হ্যাঁ। প্রমথকে বলেছিল আমায় নিয়ে ওর বাড়িতে যেতে। প্রমথ সকালে রাজী নয়। একটা নেমন্তন্ন ফসকে গেল।"

মীরা মনে মনে লঘুতা চাইছিল। সুরপতিকে নিয়ে সে কোন দিক থেকে খেলবে, বুঝতে পারছিল না। এটা ঠিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে রেষারেষি বা দ্বন্দ্ব নয়, কিন্তু একটা লোক তার তার সংসারে এসে তাকেই বোকা করে যাবে, তাকে উদ্বিগ্ন করবে—মীরার এটা পছন্দ হচ্ছিল না। সুরপতি কেন এ-বাড়িতে থেকে যেতে চাইছে তাকে বুঝতে হবে। আড়াআড়ি করে, বিরক্তি দেখিয়ে কিংবা নিস্পৃহ থেকে সেটা হবে না। বরং একটু খোলাখুলি মনে মেশামেশি ভাল। হালকা ভাবটাই দরকার এখন।

মীরা আড় চোখে সুরপতিকে দেখতে দেখতে বলল, "আমার নিন্দে করছেন?"

"কেন?"

"আমি নেমন্তন্ন খাওয়াতে পারছি না।"

সুরপতি হাত তুলে বলল, "রাম রাম, ও-কথা বললে পাপ হবে। আপনার

আতিথ্য চমৎকার।”

“ঠাট্টা করছেন?”

সুরপতি হেসে ফেলল। মীরা তার হাতের চুড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, সামান্য চঞ্চল, পা কাঁপাচ্ছে, কনুইয়ের চারপাশে খয়েরী ভাব। সুরপতি বলল, “বন্ধুর বাড়িতে এসে এর চেয়ে বেশী খাতির আর কি পাওয়া যায়?

মীরা বুঝতে পারল, সুরপতি বন্ধুকে নিয়ে ঠাট্টা করছে না, কিন্তু তার কথার মধ্যে লুকোনো একটা খোঁচা যেন মীরার জন্যে রয়েছে। মীরা বলল, “সে আপনি জানেন! আমি আপনাকে কই আর খাতির করতে পারছি।”

সুরপতির কপালের কাছটায় একটা শিরা কেমন দপদপ করে উঠল। পিঠের দিকে টান লাগছে। সামান্য ঝুঁকে বসল। সোফায় হাত ছড়াতেই সিগারেটের প্যাকেটটা আঙুলে ছোঁয়া লাগল। মীরার ঠোঁট দাঁত নাকের দীর্ঘতা লক্ষ করতে করতে সুরপতি বলল, “খাতির না হয় কমই করলেন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আপনি আমার ওপর বিরক্ত।”

মীরা আশা করেনি, এমন স্পষ্ট করে সুরপতি কথাটা বলে দেবে। বিব্রত হয়ে মীরা সুরপতির চোখের দিকে তাকাল। কিছু যেন অনুভব করল বুকের কাছে। জ্বালা না ভয়? চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকাল। নিজেকে লুকোবার ক্ষীণ চেষ্টা করল মীরা। “কেমন করে বুঝলেন?”

“আমি ছেলেমানুষ নই।”

মীরা তার ডান হাতটা হাঁটুর ওপর চেপে ধরল। বিহ্বল বোধ করল সামান্য। “আপনি যদি সবই বুঝে থাকেন তা হলে ওটাও বুঝেছেন।”

সুরপতি বলল, “অনুমান করতে পারছি।”

“তবে আর কি!”

“অনুমান সব সময় সত্যি হয় না।”

মীরার ইচ্ছে করছিল না সুরপতির দিকে তাকায়। তবু তাকাল। সন্দেহের চোখেই। “আপনার অনুমানটাই শুনি।”

সুরপতি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করল। খুলল। তারপর বলল, “আপনার সন্দেহ হচ্ছে, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করে যাব।”

মীরা যেন এ-রকম সন্দেহ করেনি—বিস্ময়কর ভান করে বলল, “ক্ষতি? কিসের ক্ষতি?”

সুরপতি মীরার ভান লক্ষ করল। “ক্ষতিটা আপনার কিসের—সে আপনি জানেন। আপনি ভাবছেন—আমি সেই পুরনো ব্যাপারটা প্রমথর কানে তুলে দেব।”

মীরা অসন্তুষ্ট হল। বিরক্ত। “বার বার আপনি কেন ওই কথাটা তুলছেন—আমি বুঝতে পারছি না। নীলেন্দু আমার কেউ ছিল না। কোন ছেলে-

বেলায় কার সংগে আমার ভাব ছিল সেই কথাটা আপনার বন্ধুকে বলে দিলে আমার যে কী ক্ষতি হবে—আমি বুঝতে পারছি না।"

সুরপতি মীরার বিরক্তি ও ক্রোধ লক্ষ করছিল। বলল, "আপনার ক্ষতি না হলেই ভাল। আমার সেটা উদ্দেশ্যও নয়।"

"তা হলে?"

"আমার কী উদ্দেশ্য জানতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ।"

সুবপতি কয়েক পলক মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ছোট করে সেটা বলা যাবে না, যায় না। আমি যেদিন সকালে আপনাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম, সেদিনও প্রথমে বুঝিনি কেন আমি এ-বাড়িতে ফিবে আসব! আমায় পিছু-টানে কে টানছিল তাও বুঝতে পারিনি।"

মীরা কেমন এক অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল উঠে চলে যায়। অথচ উঠতেও পারছিল না। ঘবের চারপাশ থেকে এক গুমোট নেমে এসেছে। ফাঁকা বাড়ি। রাধাও কোথাও নেই। সুবপতিও যেন কোথাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মীবা বলল, 'আপনি কি বুঝেছেন—আমি জানি না। আমার কোনো পিছুটান নেই।"

"থাকার কথা নয়। আমাকে আপনি দেখেননি বলেছেন। চিনতেন না।"

'আপনারই বা কেন থাকবে?"

সুবপতি শূন্য চোখে মীরার দিকে তাকিয়ে থাকল। চোখ ওঠাতেই শেডেব ছায়া চোখে পড়ল দেওয়ালে। ফুলের ডাঁটির মতন একটা দাগ ধরেছে আবছা। নিজেকেই কেমন অসহায় বোধ করছিল সুরপতি। কেন পিছুটান থাকে মানুষেব, কেন থাকবে—এ-কথা কি বলা যায়?

পেছনের দিকে তাকাতেই সুরপতির মনে হল, কে যেন এক প্যাকেট তাস খুলে ছুঁড়ে দিয়েছে, ছড়ানো ছিটোনো সেই তাসের মতন স্মৃতির নানা জায়-গায় তরু, রমা, শ্যামা, বকুল। এর মধ্যে মীরা নেই। মীরা ছিল না। কিন্তু এসেছে। বা এমনও হতে পারে মীরা ছিল, বরাবরই ছিল, প্রকাশ্যে নয়, প্রচ্ছন্নে।

সুবপতি বলল, "আপনার সংগে আমার একটা তফাত বয়েছে।"

"তফাত!"

"আমি আপনার নীলেন্দুর কাছে মার খেয়েছিলাম—" সুরপতি ম্লান হেসে বলল, "আপনি আমাদের হাতে নিশ্চয় আঘাত পাননি।"

মীরা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কলিং বেলের শব্দ হল।

তাকাল মীরা সুরপতির দিকে, তারপর উঠে পড়ল দরজা খুলে দিতে।

দরজা খুলতেই প্রমথ।

প্রমথ মীরাকে দেখে অবাক। সুরপতিকেও দেখল। দু' জনের মুখ এত গম্ভীর থমথমে কেন?

"তুমি?" প্রমথ স্ত্রীর দিকে তাকাল। "দক্ষিণেশ্বর যাওনি?"

"গিয়েছিলাম। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসেছি।"

"ফিরে এসেছ! কেন? এই না বলেছিলে ফিরবে না।"

"ফিরে এলাম। ওরা বেলুড় যাচ্ছে।"

"ও!"

প্রমথ এসে সুরপতির কাছাকাছি বসে পড়ল। "কিরে কি খবর?"

"তোর এত দেরী হল?"

"আমার দেরী নয়. ওদেরই দেরী। মৃদুলের বাবাকে বাড়ি পেঁছে দিতেই দেরী হয়ে গেল।"

মীরা জিজ্ঞেস করল, "কেমন দেখলে?"

"এখন ভালই দেখাচ্ছিল।"

"তোমার সঙ্গে কথাটথা বললেন?"

"বললেন। তবে বুড়ো মানুষ। টায়ার্ড হয়ে পড়েছেন খুব।"

মীরা চলে গেল। যাবার সময় সুরপতিকে আড় চোখে দেখে নিল।

প্রমথ সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিয়েছে। সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আরাম করছিল। সুরপতিকে সিগারেট দিল. নিজেও ধরাল।

"তোর খবর বল"—প্রমথ বলল বন্ধুকে, "সারাদিন কী করলি?"

"শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলাম।"

"বেশ করেছিস। আমি তোর জন্যেই ভাবছিলাম। আরও আগে ফিরে আসা যেত—কিন্তু গাড়ি-ফাড়ি যা লেট্ করল!...যাক গে, দেবী তো এসেই গিয়েছিল—তোকে একেবারে একা একা থাকতে হয়নি।" প্রমথ রসিকতা করল।

সুরপতি হাসি-হাসি মুখ করল।

প্রমথ সোফায় বসে বসেই পা তুলল, নামাল; হাত মাথার ওপর ওঠাল আবার নামিয়ে নিল, ঘাড়টা ঘোরাল, সোজা করল। "আমার একটা বাতের টেণ্ডেন্সি হচ্ছে বুঝলি সুরপতি, কখনও পা টনটন করছে—কখনও কাঁধ ব্যথা করছে...। মাইরি. এভাবে চললে বেতো ঘোড়া হয়ে যাব।"

সুরপতি হেসে বলল, "তোর বাত হবে না। তুই বেশ অ্যাকটিভ্।"

মাথা নাড়ল প্রমথ। চোখে কৌতুক। বলল, "অ্যাকটিভ কোথায় রে, প্যাসিভ। একেবারে প্যাসিভ হয়ে গিয়েছি। ঘর সংসার তো করলি না, করলে বুঝতিস।"

সুরপতি হেসে ফেলল।

প্রমথ এবার উঠে পড়ার ভাব করল। বলল, "শোন, আজ আমার আচার্যির

সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি তোর কথা বলেছি। তোদের মেশিনারির ব্যাপার-ট্যাপার আমি বুঝি না, ভাই। একদিন—নেকসট উইকেই তুই দেখা কর আচার্যির অফিসে। কিছু হয়ে যেতে পারে।"

সুরপতি মাথা হেলাল; দেখা করবে।

উঠে পড়ে প্রমথ বলল, "তবে তোর ওই ব্যারাকপুরে থাকলে কিছু হবে না আসা-যাওয়া করতে করতেই মরে যাবি। কলকাতায় চলে আয়। কাজ কারবার করতে হলে কলকাতায় থাকতে হবে। তুই আয়, আমি বরং এই পাড়ায় একটা ছোট বাড়িটাড়ি খুঁজে দি। এখানে থেকে যা, দুই বন্ধু মিলে ফার্স্ট ক্লাস গেঁজাব।...আরে—বলতে ভুলে গেছি। ত্রিদিব কাল সকালে ঠিকই আসছে। ও বলছিল—একটা প্রোগ্রাম করবে। মাথায় শালার দারুণ দারুণ বুদ্ধি খেলে।"

প্রমথ হাসতে হাসতে চলে গেল।

সুরপতি সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানে ফেলে দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে থাকল।

খাবার টেবিলে বসে প্রমথ মীরাকে বলল, "কাল সকালে ত্রিদিব আসবে। সে একটা প্ল্যান ঠাওরেছে।"

মীরা টেবিলের এক ধারে বসেছিল। সুরপতি প্রমথর মুখোমুখি। মীরা খাওয়া দাওয়া দেখছিল।

মীরা বলল, "কী প্ল্যান?"

প্রমথ খেতে খেতে বলল, "ত্রিদিব বলছিল, ওদের যে পুরোনো বাড়িটা পলতার কাছে পড়ে আছে, সেখানে গিয়ে একদিন হই-হই করা।"

"পিকনিক?" মীরা শুধলো।

"খানিকটা পিকনিক, খানিকটা গেটটুগেদার।...বুঝলি সুরপতি—," প্রমথ সুরপতির দিকে তাকাল, "ত্রিদিব খুঁজেপেতে ছ' সাত জনকে যোগাড় করেছে। সব আমাদের সেই পুরোনো পাপী। শিশিরকে পেয়েছে, অমল রয়েছে, কৃষ্ণকেও ধরেছে, জগবন্ধুকেও। আসছে বুধবার কিসের একটা ছুটি আছে—বুধবার না হলে পরের রবিবার। সবাই যে যার বউ নিয়ে পলতা যাবে। নো বাচ্চাকাচ্চা। স্ট্রিক্টলি ফর হাফ-ওল্ডস। সেখানে আমরা একটা হুল্লোড় জমাব।। খাব দাব, নাচব, গাইব..." বলতে বলতে প্রমথ হেসে উঠল।

মীরা বলল, "এটা কি পিকনিকের সময়? গরম পড়ে গেল।"

"পাঁজিতে বলছে বসন্তকাল।" প্রমথ জবাব দিল ঠাট্টা করে।

"বসন্তকাল!" মীরা ভুরু কোঁচকাল।

সুরপতি হেসে বলল, "তোরা কি বসন্তোৎসব করতে যাবি?"

বাঁ হাতে টেবিল চাপড়ে প্রমথ বলল, "একজ্যাক্টলি। তুই কি মনে করছিস

আমাদের বয়েস হয়েছে বলে বসন্ত থাকবে না। দেখবি, কৃষ্ণর বউ কেমন দারুণ গান গাইবে—আয় রে বসন্ত তোর কিরণমাখা পাখা মেলে—" বলতে বলতে প্রমথ তার দু হাত কাঁধের দু' পাশে ছড়িয়ে পাখা মেলার ভঙ্গি করল।

সুরপতি জোরে হেসে উঠল। "প্রমথ, তুই গানের লাইন মুখস্ত রাখছিস কিরে?"

প্রমথ মীরাকে দেখাল। "ওঁর কল্যাণে। ওই যে রেকর্ড-ফেকর্ড চালায়। শুনেছি।"

"আপনিও গানটান গান?" সুরপতি মীরাকে জিজ্ঞেস করল।

"না", মাথা নাড়ল মীরা।

প্রমথ বাধা দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল। "এই, মিথ্যে কথা বলো না। তুমি গান গাও। তুমি আবার বসন্তকে রোদনভরা বানিয়ে দাও।"

সুরপতি জোরে হেসে উঠল।

মীরা কেমন অপ্রস্তুতের মতন বলল, "কি করব বলো, তোমার কৃষ্ণর বউ যদি পাখা মেলে আমায় রোদন করতেই হবে।"

সুরপতি হো হো করে হসে উঠল। প্রমথও।

সুরপতি বলল, "চমৎকার বলেছেন।"

প্রমথ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট করল, কৌতুক করে বলল, "তোমার এই চমৎকার ব্যাপারটার জন্যেই তোমায় এত ভাল লাগে। এখন তোমায় চমৎকার দেখাচ্ছে।"

মীরা স্বামীর চোখ দেখে কী বুঝল কে জানে, অন্য কথায় চলে গেল। "ত্রিদিববাবু কালকে আসুন—আমি বলব ওসব হবে না।"

"কেন?"

"এই গরমে কেউ পিকনিক করে না।"

"পলতার সেই বাগানবাড়ি তুমি দেখোনি। গঙ্গার ধারে। গাছের ছায়ায় ঠান্ডা। কত রকম গাছ। পটাপট ডাব খাবে। গরম তুমি বুঝতেই পারবে না।"

মীরা বলল, "এ ছাড়া আরও একটা কথা আছে।"

"কী?"

"তোমরা সবাই বউ নিয়ে যাবে—" বলে মীরা সুরপতির দিকে চোখ দেখাল। "উনি কী নিয়ে যাবেন?"

সুরপতি মীরাকে দেখছিল।

প্রমথ একটু ভেবে বলল, "সুরপতির কেস আলাদা। ওর খাতিরেই এই হইরই। আমরা ওকে এটুকু প্রিভিলেজ দেব। তাছাড়া ও তো বিয়ে করেছিল। ব্যাচেলার নয়। ওতেই হবে।" বলে একটু থেমে প্রমথ আচমকা রসিকতা করে বলল, "সুরপতির এনাফ্ চান্স থাকল—কাউকে চুজ্ করে নিতে পারে—"

সুরপতি জলের গ্লাস টেনে নিয়ে মুখে তুলল।

এগারো

সকালে ত্রিদিব এসে হাজির।

প্রমথ সহর্ষে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করল, "আয়, আয়।" বলে সুরপতির দিকে হাত দেখাল, "হিয়ার ইজ দ্যাট স্মাগলার।"

ত্রিদিব নাটকীয় ঢঙে সুরপতিকে দেখছিল। কোমরে হাত দিয়ে, ভুরু কুঁচকে। তার চোখ এবং মুখের হাসি দেখলেই বোঝা যায় সব জেনেশুনেও সে একটু মজা করছে। সুরপতি হাসিমুখে বসেছিল। দেখছিল ত্রিদিবকে। সেই কোঁকড়ানো চুল, মাঝখানে সিঁথি, চোখা নাক, থুতনিব কাছটায় টোল খাওয়া।

ত্রিদিব এগিয়ে এসে দু-হাত বাড়িয়ে দিল, "ওঠো সখা, তোমায় আলিঙ্গন করি।"

প্রমথ হাসছিল। সুরপতি কেমন সঙ্কোচ বোধ কবল। উঠবে কি উঠবে না—ঠিক করতে পারছিল না।

ত্রিদিব এবার ধমক মেরে বলল, "ওঠ শালা—ভদ্রতা জানিস না।" বলে টান মেরে সুরপতিকে উঠিয়ে নিল। কোলাকুলি নয়, বন্ধুকে দু-হাতে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে ত্রিদিব বলল, "কলকাতা তোকে ওয়েলকাম করছে সুরপতি, আমরা তোকে সাদরে অভ্যর্থনা করছি। পাপীর সংখ্যা আরও একটা বাড়ল।"

সুরপতি বন্ধুত্বের এই উত্তাপ অনুভব করল। সমস্ত মন এ-সময় ছেলে-মানুষের মতন হয়ে যায়, দুর্বল, ভাবপ্রবণ। ত্রিদিবের কাঁধের কাছে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে সুরপতি বলল, "তোকে চিনতে কোনো কষ্ট হয় না। চেহারাটা রেখেছিস ঠিক।"

সুরপতি বসল। ত্রিদিবও।

ত্রিদিব বলল, "চেহারা না রাখলে মরে যাব যে! আমার কি প্রমথর চাকরি? চেম্বারে বসে এয়ারকুলারের হাওয়া খেয়ে দিন কাটে! আমরা কুলিকাবারির কাজ করি, সকাল দুপুর ঝড়-বৃষ্টি-রোদ বলে কিছু নেই দাদা, কাজ করো তলব নাও।"

ত্রিদিব ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে কাজ করে। যতটা বলল ততটা নিশ্চয় করে না, কিন্তু তাকে বারে বাইরে ঘুরতে হয় বইকি।

প্রমথ বলল, "আমি বেটা হাওয়া খাই? একবার গিয়ে বোস না চেয়ারে—

আরাম বুঝবি!"

"তোর পুরো চেহারা আরামের। দু-তিন ইঞ্চি পুরু ফ্যাট জমিয়ে ফেলেছিস। তুই সুখী লোক প্রমথ, তোর বাইরে আরাম, ঘরেও আরাম।" ত্রিদিব চোখ টিপে হাসতে লাগল। "আরাম হারাম হ্যায়।"

সুরপতি হাসল। প্রমথও।

ত্রিদিব পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে সুরপতিকে দিল, "তোর জন্যে নিয়ে এলাম। নে, ধরা।"

তিন বন্ধু সিগারেট ধরিয়ে নিল।

প্রমথ বলল, "দাঁড়া, মীরাকে খবর দি।"

ত্রিদিব বলল, "আমি সকালে খেয়ে বেরোইনি; হেভি কিছু দিতে বল বউকে।"

প্রমথ মীরাকে খবর দিতে উঠে গেল।

ত্রিদিব সিগারেট টানতে টানতে সুরপতিকে দেখছিল। "তোর চেহারা বেশ পালটে গেছে রে সুরপতি; সেই চনচনে কাঁচা কেষ্টঠাকুরের মতন চেহারা কই রে, এখন তোকে দেখলে বুড়ো বুড়ো দেখায়। চুলটুলও পেকেছে নাকি? দাঁত পড়েছে?"

সুরপতি হাসতে হাসতে বলল, "বয়েসটা কি আর কাঁচা থাকার মতন! নাকি তোর মতন স্পোর্টসম্যান ছিলাম আমরা।......এখনও ওসব শখ আছে তোর?"

"না," মাথা নাড়ল ত্রিদিব, "খেলার বয়েস কবে পার করে দিয়েছি। ওই বছরে দু-চার দিন মাঠে যাই। দেখতে। এখন ভাই সংসারের খেলা খেলছি। বউয়ের জাঁতাকলে জীবন যাচ্ছে।...যাক গে, তোর খবরটবর বল। এতোকাল পরে কলকাতায় ফিরে এলি কেন? কী করছিস-টরছিস?...প্রমথর সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল। ও যে কি বলে আমি মাথামুণ্ডু বুঝতে পারি না। প্রমথ কখনও তোকে সহজ করে কিছু বলতে পারবে না, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি করে ছেড়ে দেবে।"

সুরপতির ভাল লাগছিল। সে ভাবেনি, পুরোনো বন্ধুদের মধ্যেও এখনও এমন সহৃদয়তা রয়েছে। প্রমথকে ব্যতিক্রম মনে হয়েছিল। ত্রিদিবও কিন্তু আন্তরিক। অবশ্য ত্রিদিব বরাবরই এই রকম ছিল—হইচই করে থাকত, রগুড়ে, সিনেমার লাইনে দাঁড়ালে হাত-পা চালাত। সেই জীবনীশক্তি, এখনও ফুরিয়ে যায়নি ওর।

ত্রিদিব বলল, "তুই নাকি চার পাঁচ মাস হল কলকাতায় এসেছিস?"

"ওই রকম। কলকাতায় সপ্তাহ দুই ছিলাম, তারপর ব্যারাকপুরে চলে গিয়েছি।"

"কী করছিস ব্যারাকপুরে?"

"বিশেষ কিছু নয়। প্রথমে ভেবেছিলাম, ছোট মতন একটা কারখানা করব কাপলিংয়ের। দেখলাম ও হবে না। ভালও লাগল না। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, দমদমে কিছু ছোটখাট মেশিনারির কাজ করে। তাঁর সঙ্গে লেগে পড়লাম।"

"তুই জানিস এসব?"

"অল্পস্বল্প জানি। পেট চালাবার জন্যে কত কি শিখতে হয়েছে।"

"পেট চলছে তোর?"

সুরপতি হাসল। "কোনো রকমে।"

সিগারেটে লম্বা করে টান দিল ত্রিদিব। "কিন্তু তুই যখন কলকাতায় ফিরেই এলি—আমাদের খোঁজ খবর করলি না কেন আগেই?"

সুরপতি একটু চুপ করে থেকে বলল, "করব করব ভাবছিলাম, সুবিধে হচ্ছিল না। তা ছাড়া এত বড় কলকাতা শহরে তোরা কে কোথায় আছিস জানব কি করে।" বলে সুরপতি সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে থাকল, তারপর বলল, "তুই খোঁজখবরের কথা বলছিস! জানিস, আমি একদিন খুঁজে খুঁজে হেমন্তর বাড়ি গেলাম, সেই তোর দিনেন্দ্র স্ট্রীটে। ওদের নিজেদের বাড়ি, ভেবেছিলাম —পেয়ে যাব। গিয়ে শুনলাম, হেমন্ত মারা গেছে সাত আট বছর আগেই। কী অসুখ করেছিল।"

ত্রিদিব মাথা নাড়ল আস্তে করে; বলল, "হেমন্তর মারা যাবার খবর আমরাও পরে পেয়েছি। খুব স্যাড। ডবলু বি সি এস-এ বসে উতরে গিয়েছিল। ভাল চাকরি করছিল। জন্ডিস-মন্ডিস কী হল; ট্রিটমেন্টের গোলমাল। ছেলেটা মরে গেল।"

সুরপতি নিঃশ্বাস ফেলল। সিগারেট নিবিয়ে রেখে বলল, "তারপর থেকে কারও খোঁজ করতে ভয় করত। কার বাড়ি গিয়ে, কার খোঁজ করতে গিয়ে কী দেখব—, তার চেয়ে খোঁজ না করাই ভাল। একদিন এক অফিসে অনিলের সঙ্গে দেখা, আমাদের মন্মথর পিসতুতো ভাই, জুনিআর ছিল। অনিল আমাকে প্রমথর কথা বলল। ওদের কেমন একটা অফিসে অফিসে কানেকশন আছে। সেই খবর পেয়ে প্রমথর কাছে গিয়েছিলাম, নয়ত সাহসই হত না।"

ত্রিদিব বলল, "কথাটা ঠিকই বলেছিস। খবর-টবর নিতে সত্যিই ভয় করে। আজকাল পুরোনো কারও খবর নিতে গিয়ে শুনবি, অমুকে মারা গেছে, তমুকে কাটা পড়েছে, কেউ সুইসাইড করেছে।" বলে ত্রিদিব লম্বা টান মারল সিগারেটে, মুখ দিয়ে শব্দ করে ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর বলল, "তবু আবার এরই মধ্যে আমরা তো বেঁচেও থাকি। আমি ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের হিসেবটা ভাই ফিফটি ফিফটি করে নিয়েছি।"

সুরপতি এই সাধারণ কথাটা অস্বীকার করতে পারল না। সংসারে যেন সত্যি সত্যিই এ-রকম একটা হিসেব আছে, দুঃখ-সুখের। "তা তোর খবর-টবর কী?" সুরপতি জিজ্ঞেস করল, "তোদের সেই হরিহর ছত্র আছে?"

"না," মাথা নাড়ল ত্রিদিব, "আজকাল কি আর ও-সব টেঁকে? জ্যাঠা-মশাইরা বাড়ি ভাগাভাগি করে আলাদা হয়ে গেল। আমরাও দেখলাম মেরে-কেটে এক পুরুষের পর আবার ভাইয়ে ভাইয়ে লাগবে। দাদা বলল, সম্পত্তি নিয়ে মন কষাকষি করে লাভ নেই, এক বাড়িতে যে যার অংশ ঠিক করে নি। দাদা দোতলা নিল, তেতলা আমার, আর নীচে দোকান-টোকান ভাড়া আছে।"

সুরপতি হেসে বলল, "তোরা ভাই রাজারাজড়ার ফ্যামিলি।"

ত্রিদিব মুখভঙ্গি করে বলল, "রাজা না গজা শালা। রাজাদের ট্যাঁকে এখন তেঁতুলবিচি।"

একটু চুপ করে থেকে ত্রিদিবই জিজ্ঞেস করল, "তোর তো বাবা ছিল না। সেই কাকা-কাকির খবর কী?"

"দুজনেই গত। কাকি আগে। মা তো ধর্ম করতে গিয়েই স্বর্গে গেল।"

"তুই এতোকাল করছিলি কী? অধর্ম?" ত্রিদিব রহস্য করে বলল।

প্রমথ ফিরে এল।

তিন বন্ধুতে কিছুক্ষণ সাধারণ দু-চারটে কথার পর প্রমথ বলল, "ত্রিদিব তুই শিশিরটিশিরকে ধরতে পেরেছিস?"

ঘাড় হেলালো ত্রিদিব। "ধরেছি। সব বেটাকেই ধরেছি। দু-একজনকে মিস করছি। জানিস সুরপতি, একেই বলে বয়েস। আমাদের সেই হারাধনের দশটি ছেলের মধ্যে সাকুল্যে পাঁচ-ছ'জনের ট্রেস পাওয়া যায়, বাকিগুলো মিসিং। মিসিং মানে শুধু বেপাত্তাই নয়, আর ভিড়তে চায় না। সেই চাচাকে তোর মনে আছে—চারু চাটুজ্যে—আমরা বলতাম চাচা, সে এমন বিগ বস্, হোটেলে খানাপিনা সারে—প্লেনে দিল্লি মাদরাজ করে বেড়ায় তার বউ মাল টানে। এরা আর আমাদের মতন হেজিপেজিদের সঙ্গে মিশতে চায় না।"

প্রমথ কান চুলকোতে চুলকোতে বলল, "ত্রিদিব, সুরপতিকে বলছি কলকাতায় চলে আসতে।"

"চলে আয়—চলে আয়," ত্রিদিব বলল, "চারপাশের যা অবস্থা তাতে আমরা লোনলি হয়ে যাচ্ছি। ঠিক আমাদের মেজাজের মানুষ আর পাবি না, আজকালকার ছেলেছোকরাদের দেখেছিস—বব্-করা চুলে ফিতে বাঁধে মাইরি, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায়—"

প্রমথরা হো-হো করে হেসে উঠল।

ত্রিদিব বলল, "হেসো না দাদা, এই সব ছেলের রোওয়াব দেখেছ! পাড়ার মোড়ে মোটর বাইক নিয়ে দল করে দাঁড়িয়ে থাকবে, তুমি যদি চোখমুখ নামিয়ে

পাড়ায় না ঢোকো তোমায় আওয়াজ মারবে। এরা সব অ্যান্টিএস্টাবলিশমেন্ট। কালীপুজো, দুর্গাপুজো, সাংস্কৃতিক উৎসব করে বেঁচে আছে।...থাকুক ওরা। আমরা যে এখন দিনে দিনে মুছে যাচ্ছি—তা ভাই বুঝতে পারি।"

সুরপতি বলল, "সব জায়গাতেই এই, তবু এরা ভাল, অন্য অন্য জায়গায় যা দেখা যায়—।"

"যাক্‌গে দেখা। আমি সোজা ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি—বাইশ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত এই সব চলবে—তারপর আর চুলে ফিতে বাঁধতে হবে না, টাকে তেল ঘষতে হবে," ত্রিদিব বলল।

মীরা এল। নিজেই জলখাবার বয়ে এনেছে।

ত্রিদিব বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলল, "প্রমথকে এই জন্যেই আমি বলি, তোর গৃহসুখের অন্ত নেই। কোন কোন পদার্থ আছে ভাই?"

মীরাকে খাবার হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রমথ সেন্টার টেবিলটা টেনে দিল। মীরার মুখে ঘরোয়া হাসি। খাবার নামিয়ে রাখল সে।

প্রমথ হেসে বলল, "ত্রিদিব, মীরা আজ তোর সঙ্গে লড়ে যাবে।"

"কেন? আমার অপরাধ?" ত্রিদিব মীরার দিকে তাকাল না, খাবার দেখ ছিল। "এটা কী? লম্বা লম্বা?"

"খেয়ে দেখুন—।" মীরা মুচকি হেসে বলল।

"তা তো নিশ্চয় দেখব! কিন্তু জিনিসটা কী?"

প্রমথ বলল, "ফিশ ফিঙ্গার।"

"ফিশের আবার ফিঙ্গার হল কবে!" বলে মীরার দিকে মজার চোখে তাকাল, "তুমি কি রান্নার স্কুলে এসব শিখতে যাও নাকি?"

মীরা হেসে বলল, "যাই। প্রণতিকে এবার থেকে নিয়ে যাব।"

প্রণতি ত্রিদিবের স্ত্রীর নাম। ত্রিদিব একটা প্লেট উঠিয়ে নিয়ে বলল, "তাই যাও, তবু দুটো ফিঙ্গার খাওয়া যাবে।"

একটা অট্টহাস্য উঠল।

মীরা এবাব বলল, "ওটা ফিশ ফিঙ্গার নয়, অন্য জিনিস, খেয়ে দেখুন।"

প্রমথ সুরপতিকে বলল, "নে।"

সুরপতি মীরার দিকে তাকাল, "আমায় কমিয়ে দিন।"

প্রমথ বলল, "মানে! সকালে তো কিছু খাইনি, ত্রিদিবের জন্যে ওয়েট করছিলাম। খেয়ে ফেল।"

সুরপতি মাথা নাড়ল। "না রে, আমি পারব না।"

ত্রিদিব হাত বাড়িয়ে কিছু তুলে নিল। "নে, তোর ভার লাঘব করলাম।"

মীরা বলল, "চা নিয়ে আসি।"

সকালের জলখাবার হিসেবে আয়োজন মন্দ ছিল না। ফেঁটানো ডিমে

ভাজা পাঁউরুটির সরু সরু টুকরো, ফুলকপির বড়া, কড়াইশুঁটি সেদ্ধ, মিষ্টি।

ত্রিদিব খেতে খেতে বলল, "যাই বলিস প্রমথ, তোর বউয়ের হাতযশ আছে। ফাইন করেছে।"

দু-পাঁচটা আরও কথার পর মীরা এল। খাবার জল আর চা এনেছে। চা তৈরী করেই এনেছে এবার।

চা রেখে মীরা বসল।

ত্রিদিব বলল, "তুমি খাবে না?"

"খাব পরে।"

"চা খাও।"

"রাধা আনছে।"

সুরপতি একবার মীরাকে দেখল। সকালের বাসী চেহারা মীরার। পরনে ছাপা শাড়ি, গায়ে সাদা জামা, চুলের বিনুনি আলগা, মাথার চারপাশে উড়ো-চুল, মুখ পরিষ্কার—কোনো রকম চকচকে ভাব নেই, মসৃণ চামড়ার মধ্যেও কেমন যেন দানা-দানা ভাব এসেছে—বয়েসের না শুষ্কতার বোঝা যায় না।

কাল রাত থেকেই মীরা যেন নিজেকে পালটে ফেলেছে। আজ সকালেও সুরপতি লক্ষ করেছে, মীরা তার সঙ্গে হালকা হবার চেষ্টা করছে খুব। ঠাট্টা তামাশাও করছিল।

মীরা ত্রিদিবকে বলল, "আপনি নাকি এই গরমে আমাদের সেদ্ধ করে মারবার প্ল্যান করেছেন?"

ত্রিদিব খেতে খেতে তাকাল। "আমি কি মানুষখেকো জীব, ভাই?"

"তা হলে পিকনিক করার বুদ্ধি মাথায় এল কেন?"

ত্রিদিব খাবার ব্যাপারেই মনোযোগ দিল বেশি। বলল, "একটা পিকনিক কবায় দোষ কী?"

"এই গরমে?"

"কোথায় গরম! দুপুরে খানিকটা চড়া লাগে, নয়ত এমনিতে তো ভালই। মাইল্ড শীত রয়েছে। চমৎকার ওয়েদার।"

মীরা মাথা নেড়ে বলল, "এ-সময়ে পিকনিক করে না। দুপুরে হাঁসফাঁস করতে হবে।"

মাথা নেড়ে ত্রিদিব বলল, "কিছু করতে হবে না। তুমি যত না হাঁসফাঁস করবে তার চেয়ে বেশী করবে আমার গিন্নী, শিশিরের বউ...। তোমার চেহারা তো ভাই ফুলকো নয়।"

প্রমথ হাসছিল। সুরপতি মজা পাচ্ছিল, কথা বলছিল না।

রাধা এসে চা দিয়ে গেল মীরাকে।

মীরা বলল, "আপনি যাই বলুন, এতগুলো লোক যাবে—তাদের খাওয়া-

দাওয়া ঝক্কিঝামেলা সেটা তো মেয়েদেরই সামলাতে হবে। আমাদের দিকে কে তাকাচ্ছে?"

ত্রিদিব অবাক হবার ভান করে বলল, "সে কি, আমরা! আমরা সব সময়েই তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছি।"

প্রমথ জোরে হেসে উঠল।

মীরা বলল, "ঠাট্টা নয়। আমার মোটেই ইচ্ছে করছে না।"

"তা কি করে হয়! খুঁজে খুঁজে সব কটাকে ধরেছি। সবাই রাজী হয়েছে।. রান্নাবান্নার জন্যে ঠাকুর নিয়ে যাব।"

মীরা চা খেতে খেতে সুরপতির দিকে আড়চোখে তাকাল। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "পলতা ছাড়া আর জায়গা নেই।"

প্রমথ বলল, "ত্রিদিবদের পলতার বাড়িতে আমরা এক-আধবার আগে গিয়েছি। পুরনো বাগানবাড়ি। প্রচুর গাছপালা। গঙ্গার গায়ে বাড়ি। ভেরী ডিসেন্ট।"

ত্রিদিব বলল, "বাগানবাড়িটা এখন পোড়ো বাড়ি হয়ে পড়ে আছে। বেচে দেবার ব্যবস্থা চলছিল। প্রায় ফাইন্যাল। এখন একবার ঘুরে আসা যেত।" ত্রিদিব এবার জল খেল, আবার মীরাকে বলল, "আমি তোমায় বলছি, কোনো অসুবিধে হবে না। শিশির একটা স্টেশন ওয়াগন দেবে, আসা-যাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই। আবে, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন ওটা নিমিত্ত-মাত্র। আসলি কিছুতেই সবাইকে একসঙ্গে করা যাচ্ছে না। এই একটা সুযোগ। সবাই রাজী হয়েছে। এর পর এ কাজে ফেঁসে থাকবে, ও বলবে— বউয়ের শরীর খারাপ, মেয়ের পরীক্ষা। আমাদের মতন ছাপোষা মানুষদেব বায়নাক্কা কম নাকি!"

মীবা কোনো জবাব দিল না।

সুরপতি বলল, "কবে হচ্ছে।"

"বুধবার।"

মীরা মাথা নাড়ল। "বুধবার না।"

'কেন।"

মীরা ত্রিদিবের চোখে চোখে তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কী বলবে? একটু ভেবে নিয়ে মীরা বলল, "হপ্তার মাঝমধ্যিখানে আবার কেন?"

ত্রিদিব বলল, "দিনটা সকলের সুট করে গেছে। একবার পিছোলে আবার কোন বায়নাক্কা এসে জুটবে।"

মীরা খানিকটা খুঁত খুঁত গলায় সম্মতি দিয়ে বলল, "কি জানি; সবাই যদি রাজী হয় আমি মাঝের থেকে না করি কেন! আমায় তো দুষবেন।"

খাওয়া হয়ে এসেছিল ত্রিদিবের। জল খেল। চায়ের কাপ টেনে নিয়ে

বলল, "বুধবারই ফাইন্যাল।"

প্রমথ চা খেতে খেতে বলল, "প্রোগ্রামটা একটু বল।"

ত্রিদিব সুরপতির দিকে তাকাল। "তোকে এত খাতির কেউ দেখায় নি সুরপতি। ভেবে দেখ, তোর জন্যে আমরা সবাই ঠ্যাং তুলে নেচে উঠেছি।"

সুরপতি হেসে ফেলে বলল, "আমি কে?"

"তুই আমাদের সুরপতি। ওল্ড ফ্রেন্ড। হারাধন অ্যান্ড সনস্-এর বড় ছেলে। হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়—একটি কোথায় হারিয়ে গেল রইলো বাকি নয়...। তুই হারিয়ে গিয়েছিলি—হঠাৎ আবার ফিরে এসেছিস। হারাধন প্রাপ্তি হল।"

প্রমথ হো হো করে হেসে উঠল। মীরাও যেন সমস্ত কিছু ভুলে জোরে হেসে ফেলল।

প্রমথর হাসি আর থামছিল না। বলল, "ত্রিদিব তুই দারুণ—!"

সুরপতিও হাসছিল।

ত্রিদিব সিগারেট চাইল। "ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—" সুরপতির দিকে তাকিয়ে ত্রিদিব বলল, "আমরা এখনও বেঁচে আছি; পুরোনো কজন বন্ধু-বান্ধব; কিন্তু যে যার খাঁচায় বন্দী হয়ে গেছি। ইচ্ছে থাকলেও আর যোগা-যোগ হয় না, মেলামেশা করা যায় না। সেই কবে। একবার—বছর পাঁচেক আগে সবাই মিট্ করেছিলাম। তখন সবাই বলেছিল—প্রত্যেক বছরে একদিন করে আমরা কর্তা-গিন্নীরা এইভাবে একসঙ্গে বসব। ওটা মুখের কথাই হয়ে থাকল। মাঝে মাঝে চাগাড় দেয়, শেষ পর্যন্ত হয় না। এবারে সুর-পতির খবর দিতেই শিশির বলল, তাহলে একদিন সবাইকে ডাক। তখন আমার মনে হল, একটা লাগিয়ে দি। সুরপতি তুই নিমিত্তমাত্র—আসলে সবাই মিলে পুরোনো দিনে ফিরে যেতে চাইছি। অবশ্য পুরোনোয় আর কত ফেরা যায়।"

প্রমথ বলল, "প্রোগ্রামটা বল। আমার গিন্নীকে শোনা।"

সিগারেটে টান মেরে ত্রিদিব বলল, "আমরা কোনো ছেলেপুলে নিয়ে যাচ্ছি না। ছেলেপুলে থাকলেই ট্রাবল। এক বেটা মাথা ফাটাবে, একটা গঙ্গার দিকে ছুটবে, এ চেঁচাবে—ও কাঁদবে। তা ছাড়া গতবারেই দেখেছিলাম—কৃষ্ণ আর তার বউ বড় লোনলি ফিল করে। ওদের কাচ্চাবাচ্চা নেই। আর ভাই বলতে কি, ছেলেমেয়ে থাকলে বাধো বাধো থাকতে হয়। কোথায় একটু ইয়ে করব—সেখানেও যদি সামলে থাকতে হয়—ভাল লাগে না।"

মীরা বলল, "সকাল থেকেই কি আপনাদের হুজুগ চলবে?"

"না, একেবারে প্রাতঃকাল থেকে নয়। আমরা জাস্ট আটটায় স্টার্ট করব। গুছিয়ে গাছিয়ে পলতা পেঁছতে ন'টা, কি সোয়া ন'টা বাজবে—" ত্রিদিব

কেমন ভাবে পলতায় পৌঁছোনো হবে, কে কোথা থেকে উঠবে তার বিবরণ দিতে লাগল। শুনলে মনে হবে কারও অন্য কিছু করার নেই, শুধু একবার পলতা পৌঁছতে পারলেই হল।

প্রমথ চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল, বলল, "তোর ম্যানেজারিতে আমার ভীষণ ফেইথ; বাজার-হাটের জন্যে কাকে নিয়েছিস? শিশিরকে?"

ত্রিদিব বলল, "আবার কাকে! বাজারের লাইনে শিশির টপ্।"

মীরা এবার উঠব উঠব ভাবছিল। পলতায় যাবার ইচ্ছে তার বড় একটা ছিল না। প্রমথর বন্ধুবান্ধব বা তাদের বউদের মীরা তেমন পছন্দও করে না। তারাও মীরাকে যে পছন্দ করে তাও নয়। মীরা জানে তার কোথায় কি বদনাম রয়েছে। তবু সৌজন্য বা ভদ্রতার জন্যে সামাজিক সম্পর্কটা রাখতে হয়। ত্রিদিবের স্ত্রীকেও মীরার ভাল লাগে না।

পলতা যাবার আগ্রহ বোধ না করলেও মীরা পরে ভেবে দেখেছে, সে হাতের কাছে এমন ছুতো পাচ্ছে না, বড় ছুতো যাতে আপত্তি তুলতে পারে। বরং তুচ্ছ কোনো কারণ দেখিয়ে আপত্তি তুললে বিশ্রী একটা ব্যাপার হবে। তার চেয়ে যা হচ্ছে হোক।

মীরা উঠতে যাচ্ছিল, প্রমথ বলল, "তুমি কালকের কথাটা বললে না?"

তাকাল মীরা, "কী?"

"তুমি বলেছিলে—আমরা সবাই জোড় বেঁধে যাচ্ছি—সুরপতি বে-জোড়। ও কেমন করে এর মধ্যে ঢোকে?" প্রমথ মজা করে বলল।

মীরা একটু যেন অপ্রস্তুত বোধ করল। ত্রিদিবের দিকে তাকাল, তারপর বাঁকা চোখে দেখল সুরপতিকে। "সত্যি, এটা উচিত নয়।"

ত্রিদিব দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তাতে কি হয়েছে! আমরা হিন্দুর ছেলে, যা থাকে না তার নাম করে দেওয়ালে একটা টিপ দিলেই যথেষ্ট। সুরপতি তুই দেওয়ালে একটা টিপ দিয়ে বেরোস।"

প্রমথ হেসে উঠল।

মীরা সুরপতিকে লক্ষ করতে করতে বলল, "ব্যবস্থাটা ভাল।"

মীরা চলে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল—হঠাৎ শুনল ত্রিদিব বলছে, "সুরপতি তোর সেই—সেই কি যেন একটা ব্যাপার হয়েছিল—প্রেমট্রেম। তখন বলতিস। সেটার কি হল?"

মীরা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল। প্রমথ সিগারেট খাচ্ছে আপন মনে। ত্রিদিব সুরপতির দিকে তাকিয়ে।

সুরপতি মৃদু হেসে বলল, "কিছুই হল না।"

মীরা আর দাঁড়াল না।

বারো

দুপুরে প্রমথ কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাগজটা বিছানার পায়ের দিকে খানিকটা চটকানো অবস্থায় পড়ে আছে।

মীরা ঘরে ঢুকে দেখল, প্রমথ বেশ পরিতৃপ্ত অবস্থায় ঘুমোচ্ছে। আগের বার মীরা যখন ঘরে এসেছিল, দেখেছে, প্রমথ সোজা হয়ে শুয়ে ছিল, ঘুমোচ্ছিল—কিন্তু তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো শব্দ হচ্ছিল না। এবারে এসে দেখল, প্রমথ পাশ ফিরে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, নাক ডাকার একটা শব্দও হচ্ছে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিল মীরা। এমনিতে দুপুরে দরজা ভেজানোর দরকার করে না, প্রমথ বাড়িতে থাকলেও নয়। এ-সময় বাড়ি ফাঁকা, রাধা নীচে চলে যায়, শোবার ঘরের দরজা খোলা থাকল কি থাকল না তাতে কিছুই আসে যায় না। আজ রাধা এখন নেই, কিন্তু সুরপতি রয়েছে।

মীরা প্রথমে দরজা ভেজিয়েছিল, তারপর একটু অপেক্ষা করে ছিটকিনি তুলে দিল।

জানলার দিক থেকে তেমন আলো আসছে না। সকালের পর থেকেই রোদ ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল; ক্রমে সেটা মেঘলা মেঘলা রঙ নিয়েছে। আকাশে কোথাও মেঘ জমেছে, বিকেল পর্যন্ত থাকবে কিনা কে জানে! মেঘলা-মেশানো আলো এবং জানলার পরদার জন্যে ঘর এই দুপুরে খানিকটা ঝাপসা দেখাচ্ছিল। মীরা দরজার ছিটকিনি তুলে একবার জানলার কাছে দাঁড়াল—তারপর সরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এল। এই সময়টায় মীরার বড় বেশী ঠোঁট ফাটে, চড়চড় করে ঠোঁটের আগা। মাঝে মাঝেই ক্রীম দিতে হয়। হাতের আঙুলের ডগাগুলোও ওই রকম অবস্থা দাঁড়ায়, খসখস করে, খড়ি ওঠে, পাতলা পাতলা ছাল উঠে আসে। ঘামাচির মতন দানা হয় আঙুলের ডগায়।

মীরা ঠোঁটে ক্রীম দিল। আঙুল দিয়ে ঘষল। তারপর খানিকটা ক্রীম হাতের তালুতে নিয়ে দুহাত ঘষতে ঘষতে বিছানায় এল। প্রমথ একটু জোরে, যেন দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—এইভাবে শ্বাস টেনে আবার স্বাভাবিকভাবে ঘুমোতে লাগল।

বিছানায় বসে মীরা প্রথমে হাতে ক্রীম মাখা শেষ করল, করে হাত দুটো মুখের চামড়ায় ঘষে নিল। বালিশ গুছিয়ে শোবার সময় মাথার চুলগুলো খাটের মাথার দিকে সরিয়ে রাখল। শ্যাম্পু করা চুল এতোক্ষণে শুকিয়ে

গিয়েছে। তবু ছড়িয়েই রাখল।

শোবার সঙ্গে সঙ্গে মীরা স্থির হতে পারে না। তার কতকগুলো মেয়েলী অভ্যেস আছেঃ কান চুলকোবে, চুড়ি নাড়াচাড়া করবে, সেফটিপিন হাতে থাকলে দাঁত খুটবে, একবার জামার বোতাম আলগা করবে, হাই তুলবে—এই সব।

মীরা কড়ে আঙুল দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে ঈষৎ ছলছলে চোখে স্বামীর দিকে তাকাল একবার। প্রমথ ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে।

কিছুক্ষণ নিজের শরীর নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর মীরা অন্যদিকে পাশ ফিরল, দেওয়ালের দিকে। হাই তুলল মিঠে শব্দ করে। চোখ বুজল। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার তাকাল। দেওয়ালের দিকে ছায়া বেশ ধূসর, কোথাও কোথাও কালচে দেখাচ্ছে।

প্রমথ বেশ ঘুমোচ্ছে। মীরা দুপুরের ঘুমের অভ্যেসটা অনেক দিন ধরে কাটাবার চেষ্টা করছে। শরীর যখন মোটা হয়ে যাচ্ছিল তখন থেকেই। ভাত আর ঘুম দুটোই মোটা হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট—এই রকম সে শুনত। দুপুরে এক পেট ভাত খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে ঘুমিয়ে পড়ে—বিকেলে হাই তুলতে তুলতে ওঠা বাঙালী মেয়েদের স্বভাব। এতেই নাকি চর্বি বেড়ে যায়। কথাটা শোনার পর থেকে মীরা ঘুমটা তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। আজকাল মীরা দুপুরে বড় একটা ঘুমোতে পারে না—এক একদিন অবশ্য ঘুমিয়ে পড়ে। না ঘুমোলে চুপ করে শুয়ে থাকে, বই পড়ে, কিংবা আরও কিছু করে।

আজ দুপুরটা গুমোট। গরম লাগছে। আকাশে মেঘ হবার জন্যেই বোধ হয়। এই সময়ে এক-আধ দিন বৃষ্টি হয়, ঝোড়ো ভাব ওঠে। এ বছরে প্রচণ্ড শীতের সময় একদিন বৃষ্টি হয়েছিল—তারপর আর জলটল হয় নি।

মীরার ক্রীম মাখা হাত সামান্য ঘামছিল, বুকের কাছটাও। পাখা চালানোর সময় এটা নয়—নয়ত সে পাখা চালাত। এই রকম গরমে বুধবার দিন পলতা যেতে হবে ভেবে বিরক্তিই লাগছিল। তার সামান্যও ইচ্ছে নেই পলতা যাবার। তা ছাড়া তখন তার শরীরটাও ভাল থাকার কথা নয়। প্রমথদের এই হললা-বাজি তার ভাল লাগে না। আগের বারও মীরা দেখেছে, শেষ পর্যন্ত ফেরার সময় যে যতই গদগদ হোক—সারাটা দিন মেয়েরা কেমন যে যার নিজের ছেলে-মেয়ে, নিজের নিজের গল্প, নিজেদের মরজি নিয়েই ব্যস্ত ছিল বেশী। সব-চেয়ে বিশ্রী লেগেছিল মীরার, প্রমথর বন্ধুবান্ধবের বউরা তাকে কোনো সময়েই পছন্দ করে নি। দু-চারটে এমন কথা বলেছিল যাতে বেশ চটে গিয়েছিল মীরা।

প্রণতির চেয়েও ছন্দা ঠোঁট কাটা। প্রণতির ওপর ওপর ভালমানুষি, ভেতরে বিশ্বনিন্দা। সুলতা আর কাঁকনের তো রেষারেষি—কার বর কতবার

প্লেনে দিল্লি যায় তাই নিয়ে।

হাত চটচট করছিল বলে মীরা দুহাত আবার ঘষতে লাগল। ক্রীম আর ঘাম মিশে গেল চামড়ার তলায়। ঠিক এই সময়, আঙুলের ডগাগুলো আরও মোলায়েম করতে গিয়ে হঠাৎ মীরা নিজের হাতের দিকে তাকাল। সেই বিশ্রী কাটা দাগটা তার নজরে পড়ল।

কিছুক্ষণ দাগটা দেখল মীরা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

আর ঠিক তখনই তার মনে হল সকাল থেকে সে যেন খানিকটা উসখুস করছে। কেন?

মানুষের এক একটা ধারণার কোনো মানে হয় না। কোনো কোনো কৌতূহল এমন আচমকা দেখা দেয়—যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

ত্রিদিবদের চা জলখাবার খাইয়ে মীরা যখন অন্য অন্য কাজে ব্যস্ত হল—ধোপাকে কাপড়-টাপড় দিচ্ছিল তখন একবার সে হঠাৎ হেসেও ফেলেছিল। হেসে ফেলেছিল—ত্রিদিবের মুখে সুরপতির প্রেম করার কথা শুনে। সুরপতি প্রেম করেছিল?

তারপর আবার, মীরা যখন নিজের শোবার ঘরে কিছু খুচরো কাজ সারছিল—তখনও হঠাৎ ওই কথাটা মনে পড়ল। ত্রিদিব কি বন্ধুর সঙ্গে ঠাট্টা করছিল? তামাশা? সুরপতি যে প্রেম করতে না পারে তা নয়, কিন্তু কার সঙ্গে করল? মীরা হালকা মনেই ভেবেছিল—যদি বা সুরপতি কোনো প্রেম করেই থাকে—সেটা ওই রকমই—ছেলেমেয়েরা যেমন করে হরদম। তেমন কিছু নয়—হলে প্রমথ জানত। প্রমথর কাছে মীরা সুরপতির যত কথা শুনেছে তার মধ্যে প্রেমট্রেমের কথা তো ছিল না।

স্নান করার সময়—মীরা যখন অত্যন্ত শীতল, পরিচ্ছন্ন হয়ে গা মুছছে, শ্যাম্পুর গন্ধ সাবানের গন্ধ পাতলাভাবে বাথরুমের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, মাথার চুল তোয়ালেতে মুছতে মুছতে মীরার আবার সুরপতির প্রেমের কথা মনে পড়ল। আর এই সময় একটা মজার কথা—একেবারেই যুক্তিহীনভাবে তার মাথায় এল। আচ্ছা, এমন যদি হয়—সুরপতি তার বন্ধুদের কাছে হাজারিবাগের সেই দোলের দিনের গল্প বলে থাকে? মানে, সুরপতি হয়ত বলেছিল—একটা মেয়ের সঙ্গে, আমি প্রেম করতে গিয়েছিলুম ভাই, কিন্তু নিজের মাথা ফাটানো ছাড়া কিছুই হল না।

এতটা বাড়াবাড়ি কল্পনার কোনো অর্থ হয় না। মীরাও এই অর্থহীন কল্পনাকে বেশিক্ষণ মাথায় রাখল না। হালকা মনে নিজেই মনে মনে হেসে চিন্তাটা উড়িয়ে দিল।

উড়িয়ে দিল, তবু পুরোপুরি উড়ে গেল না। বাথরুমের জানলার ঘষা কাচের দিকে চোখ রেখে মীরা যেন কোনো দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে খোঁজবার চেষ্টা

করছিল। পায়ের তলায় ঠাণ্ডা, গায়ের চামড়ায় সুগন্ধ, চোখের পাতায় আর্দ্রতা। দূরের কোনো দৃশ্য যেন ক্রমাগত দূরান্ত হয়ে যাচ্ছে।

তারপর আরও দুতিন ঘন্টা কাটতে চলল। প্রমথ আর সুরপতি যখন খেতে বসেছিল—তখনও একবার সুরপতির দিকে তাকিয়ে মীরার সেই কথাটা মনে পড়েছিল। মুখে না হলেও মনে মনে মীরা সুরপতির দিকে তাকিয়ে হাসির ছলে বলেছিলঃ আপনারও প্রেম ছিল? কার সঙ্গে?

আর এখন, দুপুরে, স্বামীর পাশে শুয়ে মীরার হঠাৎ আবার সেই একই কথা মনে পড়ল। মনে পড়ার পর, মীরা নিজেই যেন বেশ বিরক্ত হল। তার হল কী? বার বার এই তুচ্ছ, বাজে কথাটা কেন তার মনে পড়ছে? এই কৌতূহল তার কেন? একটা উড়ো চুল যদি মুখে গলায় কোথাও কোনো বকমে আটকে যায় তা হলে যে রকম অস্বস্তি হয়, বার বার মানুষ সেটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে মীরা যেন সেই রকম করছে। সুরপতির প্রেমের কথাটা তার কাছে এ রকম অস্বস্তিদায়ক কেন হবে?

মীরা তার হাতের কাটা দাগটা নিবিষ্টভাবে দেখল। দেখে মনে করবার চেষ্টা করল, সুরপতিকে সে কি সত্যি সত্যিই কোনোদিন নজর করে দেখেছে তখন? লক্ষ করেছে? কোনোদিন কি সাধারণ আলাপও হয়েছিল?

মানুষ সমস্ত কিছু মনে রাখতে পারে না। মীরা ভেবে দেখল, হাজারি-বাগের কিছু কিছু কথা যেমন তার মনে আছে—অনেক কিছুই আবার মনে নেই। যেমন, তাদের বাড়িতে যে লোকটা কাজ করত তাকে মনে নেই, উলটো দিকের বাড়িটার কী রঙ ছিল—ফটকটা কেমন ছিল মনে পড়ে না মীরার। হাজার ভাবলেও মীরা মনে করতে পারবে না—স্টেশনের প্লাটফর্মে—যেখানে অতবার বেড়াতে গিয়েছে সেখানে ক'টা গাছ ছিল? একটা কৃষ্ণচূড়ার কথাই শুধু তার মনে আছে। মীরা নিজের জীবনের, তার বাল্য থেকে আজ পর্যন্ত —এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের জীবনের কত কি ভুলে গেছে আর হাজারিবাগের কথা খুঁটিনাটি মনে রাখবে? তাই কি সম্ভব?

সুরপতিকে মীরা মনে করতে পারছিল না। চোখ বুজে শুয়ে থাকল। মনে মনে হাতড়াল—কিছুতেই মনে পড়ল না। অথচ মীরা ভেবে দেখল, সুরপতি যেদিন এ বাড়িতে এল, এবং পরের দিন সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেল—সেদিন সে দুপুরে হাজারিবাগের কথা ভাবছিল। কেন ভাবছিল?

মীরার মনে হল, সে ভাবনাটা স্বাভাবিক ছিল। সুরপতিই তাকে তার হাতের কাটাটার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। যদি কেউ আচমকা কিছু মনে করিয়ে দেয়—যার মধ্যে জীবনের কিছু রয়ে গেছে—কোনো ঘটনা—যা দুঃখের —যার মধ্যে যন্ত্রণা ও গ্লানি জড়িয়ে রয়েছে—তবে সে ঘটনার কথা মনে না

করে উপায় কি!

প্রমথ শব্দ করে শ্বাস নিল আবার। মীরা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার স্বামীকে দেখবার চেষ্টা করল। সোজা হয়ে শুয়েছে প্রমথ। ডান হাতটা মাথার ওপর তুলে দিয়েছে।

লোকটা ঘুমোতেও পারে। মীরার বিরক্তিই হল। দিন দিন যত বেঢপ চেহারা করছে—ততই তার ঘুম বাড়ছে। সত্যি, প্রমথ কি কোনোদিন আয়নায় তার চেহারা দেখে বুঝতে পারে না—এইভাবে ফুলতে শুরু করলে আর দু'চার বছর পরে একটা গোলগাল মাড়োয়ারী-মার্কা চেহারা হবে তার। আসলে প্রমথ দিন দিন কেমন ভাঁড়ের মতন হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া, অফিস ঘুম, বউ নিয়ে বাজে আদিখ্যেতা ছাড়া কিছু জানে না। এক ধরনের শৈথিল্য নেমে এসেছে তার শরীর-স্বাস্থ্য, মনে। মীরার এক এক সময় সত্যিই মনে হয়, এই লোকটার সঙ্গে তার বিয়ের কোনো মানে হয় না। হয়ত বিয়েটাও হত না—যদি বাবা বেঁচে থাকত, যদি বাবা মারা যাবার পর সংসারে হাজার রকম ঝঞ্ঝাট না জুটত। বাবা মারা গিয়ে সংসারে এমন বেনো জল ঢুকে পড়ল যে, মা কিছুই সামলাতে পারছিল না। মাথার ওপর তেমন কোনো যোগ্য অভিভাবকও ছিল না। যার ফলে তখন মার কাছাকাছি যে সব কাছাকাছি সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন—বাবার বন্ধুবান্ধব ছিল—তারা যা বলল—মা তাতেই রাজী হয়ে গেল। বাদবিচার করলো না। প্রমথ কোনো দিক থেকেই মীরার স্বামী হবার উপযুক্ত নয়। প্রমথ তার চাওয়ার বেশী পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু মীরা যা পেয়েছে তা তার পছন্দের অনেক নীচে।

মীরার হঠাৎ কেমন মাথা গরম হয়ে গেল। কে চেয়েছিল প্রমথকে বিয়ে করতে? মীরা চায় নি। তার পছন্দ জেনে কেউ তার বিয়েও দেয় নি। হাতের কাছে প্রমথ জুটে গিয়েছিল—পাত্র হিসেবে তার গুণ বলতে মোটামুটি একটা ভাল চাকরি বই আর কোনো জলুস নেই; বনেদিআনা নেই, তীক্ষ্নতা বলো, ব্যক্তিত্ব বলো—কিছু নেই। পুরুষমানুষ কেমন হবে—মীরা বলতে চায় না—কিন্তু বুঝতে পারে প্রমথ ডালভাতের মতন সাদামাটা। অবশ্য, মীরা প্রমথর সাদামাটা সরল স্বভাবকে নিন্দে করছে না। কিন্তু কোনো মানুষ যদি হাবা-গোবা সাদামাটা হয়—তাকেই ভালবাসতে হবে এমন কোনো কথা আছে? যদি তাই হত তবে হাবাগোবারাই মেয়েদের একমাত্র কাম্য পুরুষ হত।

শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না মীরার। বড় গুমোট লাগছিল। চারদিক কেমন ভেপসে যাচ্ছে। কে জানে আজ ঝড় বৃষ্টি হবে কিনা! যদি হয় হোক। আবার একটু ঠান্ডা পড়ুক। মীরা যেন মনে মনে কোনো রকম আরাম চাইছিল। এই গুমোট আর তার ভাল লাগছে না।

শেষ পর্যন্ত মীরা বিছানায় উঠে বসল। প্রমথ তখনও ঘুমোচ্ছে। পুরু

পুরু ঠোঁট ফাঁক হয়ে রয়েছে. পান খেয়েছিল প্রমথ—ঠোঁট আর দাঁতে পানের লালচে ছোপ শুকিয়ে খয়েরী দেখাচ্ছে। মোটা মোটা দুটো হাত এখন পেটের ওপর। লোমে ভর্তি। আঙটির পাথরটা মাছের পিত্তির মতন দেখাচ্ছিল।

মীরা বিছানা থেকে নেমে পড়ল।

রাত্রে আবার সেই বিছানাতেই শুয়ে মীরা স্বামীকে বলল, "আমার যদি শরীর ভাল না থাকে আমি কিন্তু পলতা যেতে পারব না।"

প্রমথ দুপুরে যথেষ্ট ঘুমিয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি তার ঘুমিয়ে পড়াব কথা নয়। মীরা সবেই বিছানায় এসে শুয়েছে। প্রমথ বলল. "শরীর খারাপ হবে কেন?" বলেই তার কিছু খেয়াল হল, আবার বলল. "তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝি না। একবার যদি মাথায় কিছু ঢুকলো—কার বাবার সাধ্য তোমায় বোঝায়।"

মীরা বলল. "তোমার এই নাচানাচিও আমার মাথায় আসে না। এখন পলতায় গিয়ে হইচই করার কী আছে?"

"কী আবার থাকবে—' আমরা কি পলতা থেকে গঙ্গা জল আনতে যাচ্ছি' এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলো তুমি! হাজার বাব শুনছ, পুরোনো বন্ধু-বান্ধব মিলে একবেলা গালগল্প মজা করতে যাচ্ছি—তবু সেই এক কথা।"

মীরা মাথা গরম করল না। সে ঠিক করে নিয়েছিল—প্রমথর সঙ্গে আজ ঝগড়াঝাটি, রাগারাগি করবে না। স্বামী চটে যাচ্ছে দেখে মীরা প্রথমে একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "তোমার মতন বোকা আর আমি দেখি নি।"

"কেন?"

"আগের বারের কথা ভেবে দেখো। তোমার বন্ধুর বউরা আগাগোড়া যে যার কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত থাকল। ছন্দার কী রাগ।"

প্রমথ বলল, "ও রকম এক্টু আধটু হয়। মেয়েরা কবে রাগারাগি করল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তুমি মন্দটা দেখছ ভালটা দেখছ না। আমরা সবাই খুব এন্‌জয় করেছিলাম।"

"আমি করি নি।"

"কেন?" প্রমথ স্ত্রীর দিকে তাকাল। "তা কিন্তু তখন মনে হয়নি।"

"তোমার তো হবে না। তুমি কোন্ দিন চোখ চেয়ে দেখতে শিখলে?"

প্রমথ কেমন ধাঁধায় পড়ল। বলল, "কেন. কী হয়েছিল?"

মীবা পুরোনো কথায় গেল না। খানিকটা যেন অভিমানের গলায় বলল. "তোমার বন্ধুর বউরা আমায় পছন্দ করে না। তারা আমায় কী বলে জানো না?"

প্রমথ চুপ করে থাকল। মীরাকে নিয়ে বাইরে কিছু কিছু দুর্নাম আছে।

সে সব দুর্নামের কথা ভাবতে বসলে নিশ্চয় খারাপ লাগবে। বিশেষ করে—যখন মীরার পরুষঘেঁষা স্বভাবের কথা কানে যায়। প্রমথ স্ত্রীর এ-ব্যাপারটা জানে। কখনও কখনও দার্জিলিংয়ের সেই জামাইবাবুর ব্যাপারে প্রমথ রীতি-মত ক্ষুন্ন হয়েছে। হয়ে দেখেছে—অশান্তি ছাড়া সংসারে আর কিছু হয়নি। কিন্তু কোথায় কে কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসলে সংসারে বাঁচা যায় না। প্রমথ বলল, "কাকে কান নিয়ে গেল শুনে তুমি কাকের পেছনে ছুটবে নাকি! আসলে তোমায় ওরা হিংসে করে।"

"তাই বা কেন করবে?"

"বাঃ, তুমি দেখতে ভাল। সুন্দরী। এই বয়েসেও তোমার এমন খাসা চেহারা। তোমার মেয়ে দার্জিলিঙে পড়ে। ছেলেকে তোমার মা মানুষ করছে। হাঁড়িকুড়ি সংসার সামলাতে সামলাতে তোমার হাঁড়ির হাল হচ্ছে না। তা ছাড়া তোমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। অন্যরা হাজার রকম ঝঞ্ঝাট সামলে মরছে। তোমায় হিংসে করবে না। আমি যদি মেয়ে হতাম, আমিও করতাম।"

মীরা এই প্রসঙ্গটা আর বাড়াতে চাইল না। বাড়াতে গেলে এমন সব কথা উঠবে—যা একেবারেই নোংরা।

অন্ধকারে ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে মীরা খানিকক্ষণ শুয়ে থাকল। তারপর স্বামীর দিকে পাশ ফিরল। হাত ছড়িয়ে দিল। বলল, "আমি মাঝে মাঝে কী ভাবি জানো?"

প্রমথ গায়ের ওপর স্ত্রীর হাত অনুভব করতে করতে বলল, "কী ভাব?"

"ভাবি তোমার মতন মানুষের বিয়ে করা উচিত ছিল না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকলেই পারতে।"

প্রমথ প্রথমে কথা বলল না। তারপর হালকা গলায় বলল, "তুমি আমার জীবনের কতটুকু আর জান? আজ দু পায়ে খাড়া হয়ে গিয়েছি—নিজেকে তালেবর মনে করতে পারি। কিন্তু আমার—এই কলকাতাতেই—কলেজে পড়ার সময় এমন দিন গেছে যখন বন্ধুরা যদি না আমায় সবাই মিলে দেখত, আমি মরে যেতাম। আমার খাওয়া পরা থাকা—সবই ওই বন্ধুদের দয়ায় হয়েছে। তুমি জানো, ওই সুরপতি আমার পরীক্ষার ফিজ জমা দিয়েছে, আমার যখন একবার টাইফয়েড হল—সুরপতি আমায় হাসপাতালে ভর্তি করে রোজ দেখা-শোনা করত। কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে, মীরা। আমার আছে। কৃতজ্ঞতা ছাড়াও বন্ধুদের জন্যে আমার ভালবাসা আছে। ওরা আমায় যে যাই বলুক, যা খুশি মনে করুক—আমি ওদের ভালবাসি।"

মীরা স্বামীর গলার স্বরে ছেলেমানুষির আবেগ অনুভব করল। যেন আদরই করছে—এমনভাবে স্বামীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "তোমার সুরপতির গল্প তো অনেক শুনলাম। কিন্তু ওই কথাটা তো

বললে না।"

"কী?"

"ত্রিদিববাবু যা বলছিলেন?"

"কী বলছিল?"

"বারে, শুনলে না। ত্রিদিববাবু বলছিলেন না যে, তোমার সুরপতি কোথায় প্রেম করত।"

প্রমথ একটু ভাবল। তারপর হেসে ফেলে বলল, "দূর—ত্রিদিব ঠাট্টা কর ছিল। কলেজে পড়ার সময় আমরা তখন ইয়াং। পাড়ার ছাদে একটা মেয়েকে দুদিন দেখলেই আমরা তাকে লাভার বানিয়ে ফেলতুম। হাসি তামাশা আর কি! প্রেম করত অমল।"

"তুমি করতে না তো?" মীরা স্বামীর গায়ে চিমটি কাটল আস্তে করে।

"পাগল! আমার সঙ্গে প্রেম করতে কার বয়ে গেছে।"

"যাক্ রক্ষে।"

প্রমথ স্ত্রীর দিকে পাশ ফিরে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

"করলেও আমার আপত্তি ছিল না—" মীরা হেসে বলল, "সবাই তো করে। না বুঝেই।"

"ওটা প্রেম নয়।"

"নয়?"

"ছেলেমানুষী! কত বন্ধুকেই তো দেখলাম—।"

"আবার এক আধজন অন্যরকমও হয়।"

"তা হয়। আমার এসব মাথায় তেমন ঢোকে না।"

মীরা ঠোঁটের ডগায় দাঁত চেপে থাকল। তারপর বলল, "আমি মনে করে ছিলাম, কে জানে—তোমার সুরপতি হয়তো সেই প্রেমের জন্যে ঘর সংসারই করল না। বিয়ে করেও বউয়ের সঙ্গে থাকল না।"

প্রমথ সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "নিজের ব্যাপার—মানে এই দশ পনেরো বছরের প্রাইভেট লাইফ সম্পর্কে সুরপতি কিছু বলে না। একেবারে সাইলেন্ট। তবে—ওই যে প্রেমের কথাটা ত্রিদিব বলছিল—আমার সেটা মনেও নেই। শুধু মনে আছে—বাইরে কোথায় যেন একটা মেয়েকে সে কী চোখেই যেন দেখেছিল। একবার দোলের দিন মেয়েটার গায়ে রঙ দিয়েছিল—এ রকম একটা গল্প বলত। ঠাট্টাই করত বোধ হয়। সুরপতি তখন কিন্তু দেখতে বেশ ছিল। টানা টানা চোখ, ঝাঁকড়া চুল, ভীষণ মোলায়েম মুখ। শালাকে কবি কবি দেখাত. .।"

মীরা স্বামীর গায়ের ওপর তার হাতটা ফেলে রাখল। কিন্তু সমস্ত হাত যেন হঠাৎ অসাড় হয়ে আসছিল।

তেরো

মীরার ঘুম ভেঙে গেল। ভাঙা ঘুম জোড়া দেবার জন্যে সে কিছুক্ষণ ছেঁড়াছেঁড়া তন্দ্রার মধ্যে শুয়ে থাকল, স্থির হয়েই, যেন যে কোনো মুহূর্তে আবার ঘুমিয়ে পড়বে। শুয়ে থাকলেও ঘোলাটে চেতনা আর নিবিড় হয়ে আসছিল না। বরং মীরা অনুভব করছিল—সে ক্রমশই জেগে উঠছে। এ-সব সময় শারীরিক অস্বস্তি বোধ করে উঠে পড়া প্রায় অভ্যাসের মতন হয়ে পড়েছে। মীরা উঠে পড়ল। মশারি তুলে মাটিতে পা নামাল।

শীত রয়েছে। চাদর নিল না মীরা। অগোছালা আঁচল গায়ে জড়িয়ে বাতি জ্বালল। সমস্ত ঘরটা যেন ঘুম এবং ঠাণ্ডার মধ্যে ডুবে রয়েছে।

ছিটকিনি খুলে বাইরে আসতেই শীতের ঝাপটা গায়ে লাগল। ভোর হয়নি। হয়ে আসছে। রাত্রের শেষ অন্ধকারের মধ্যে ভোরের পাতলা ফরসা ভাব মেশানো। মীরা শীত সামলাতে সামলাতে বাথরুমে চলে গেল।

বাথরুম থেকে ফেরার সময় মীরা আর একবার চারপাশে তাকাল। এই ঘোলাটে ভোরে সবই ঝাপসা অস্পষ্ট করে চোখে পড়ে। এখনও কোথাও একটা কাক ডাকছে না; সবই নিঃসাড়; শুধু ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা সর্বাঙ্গ কম্পিত করছিল। হঠাৎ মীরার নজরে পড়ল, সুরপতির ঘরের দরজা খোলা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ঘাড় ফিরিয়ে ভাল করে তাকাল। দরজা পুরোপুরি খোলা নয়, একটা পাট খুলে আছে খানিকটা, ঘরে বাতি জ্বলছে না।

মীরা কিছু বুঝতে পারল না। মুহূর্তের জন্যে তার বুকের মধ্যে চমক লাগল। সুরপতির ঘরের দরজা খোলা কেন? সে কি জেগে উঠেছে? আবার কি পালিয়ে গেল নাকি? এখনও ভাল করে ভোর হল না, কাক ডাকল না, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই—এ-সময় কোথায় যাবে সুরপতি! মীরার বিশ্বাস হচ্ছিল না, আবার সন্দেহও জাগছিল। নিজের ঘরের দিকে না গিয়ে সে সুরপতির ঘরের দিকেই পা বাড়াল।

খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল মীরা। ঘরের মধ্যে রাত্রের অন্ধকার এখনও এমন করে জমে আছে যে মশারির মধ্যে কিছু দেখা যায় না। তবু চোখে পড়ল, সুরপতি বিছানায় শুয়ে আছে।

ফিরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও মীরার মনে হল, মানুষটা সত্যি সত্যি বিছানায় আছে কি না দেখে যাই। কখনও কখনও ঘুমের চোখে বড়

ভুল হয়। যেন নিশ্চিন্ত হবার জন্যে নিঃশব্দে মীরা ঘরে ঢুকল, বাতি জ্বালতে গিয়েও জ্বালাল না, মশারির পাশে এসে দাঁড়াল। সুরপতি ঘুমোচ্ছে। বুক পর্যন্ত কম্বল ঢাকা, ছাদমুখো হয়ে শুয়ে আছে।

স্বস্তির মতন নিঃশ্বাস ফেলে মীরা সরে এল। আর দাঁড়াল না। শীত করছে। এই অসাড়, শান্ত প্রত্যুষের কোনো গভীর থেকে যেন কেমন এক বিস্ময় ও দ্বিধা জেগে উঠছিল। বেদনাও।

ঘরে এসে মীরা বাতি নেবাল। শীতে তার গায়ে কাঁটা ফুটছে। বিছানায় ফিরে এসে হালকা লেপটা গলা পর্যন্ত টেনে নিল।

শীতের কাঁপুনি এবং গায়ের কাঁটা মিলিয়ে যাবার পর মীরা চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতে আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। ঘুম আসছিল না। সুরপতির ঘরের দরজা কেন খোলা ছিল মীরা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। সুরপতি কি কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বাইরে এসেছিল? ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ার সময় দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে? ও কি বিছানায় এখনও চুপ করে শুয়ে আছে? ঘুমের ভান করেই দেখল, মীরা তার ঘরে এসেছিল?

সত্যিই এ বড় আশ্চর্যের! একটা লোক দরজা খুলে কেমন করে ঘুমোয়? এ কি সুরপতির অভ্যাস না ভুল? এর আগে আর দু-একদিন, সুরপতি এ-বাড়িতে থাকার সময়, মীরা কিছু লক্ষ করেনি। করেনি কারণ সে এভাবে জেগে ওঠেনি, বাইরেও আসেনি। যদি বা জেগে থাকে, মীরার খেয়াল আসছে না, সে সুরপতির ঘর লক্ষ করেছে কিনা! করার কারণ ছিল না। হয়ত এই-ভাবেই মানুষটা শুয়ে থাকে। দরজা খুলেই। হতে পারে এ তার অভ্যাস। কিংবা এমনও হতে পারে—সুরপতি দরজাটা খুলেই রেখেছে, বরাবর খুলেই রাখে। কিন্তু কেন?

সুরপতি কেন তার শোবার ঘরের দরজা খুলে রাখে ভাবতে গিয়ে মীরার সন্দেহ হল, সুরপতি কি তাকে প্রত্যাশা করে? নিত্য এই প্রত্যাশা করে যাচ্ছে? মীরার প্রত্যাশা? সে কি জেগেও থাকে?

মীরা বড় করে শ্বাস ফেলার সময় মুখ হাঁ করল; সারা রাতের কোনো গন্ধ যেন শ্বাসের বাতাসের সঙ্গে তার নাকে লাগল ফিকে ভাবে। আর আচমকা—খুবই আচমকা—হারানো কোনো জিনিস—যা মনে মনে খুঁজেও মীরা পাচ্ছিল না, না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করছিল—সেই জিনিসটা পেয়ে গেল। মীরার মনে পড়ে গেল, সে স্বপ্ন দেখছিল, দেখতে দেখতে স্বপ্নটা ভীতিকর হয়ে ওঠায় তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

স্বপ্নটা মীরা এতোক্ষণে মনে করতে পারল। প্রথমে এলোমেলো, খাপ-ছাড়াভাবে কিছু কিছু মনে এলেও সেই বিশৃঙ্খল ছবিগুলো পরে মোটামুটি

গুছিয়ে আসছিল। মীরাও যেন প্রাণপণে সেটা গোছাবার চেষ্টা করছিল।

মীরা দেখলঃ সে কোথাও কোনো সিমেন্ট বাঁধানো উঁচু বেদীতে বসে আছে। সামান্য তফাতে একটা কুয়ো, আশেপাশে বাগান। চারদিকে তাকাতেই সে বুঝতে পারল, হাজারিবাগের সেই আশ্রমের বাগানে সে বসে আছে। ঠাকুরের মন্দির আর তার মস্ত পরিচ্ছন্ন চাতালও চোখে পড়ল মীরার। হঠাৎ বাতাসে কিছু উড়ে এসে চোখে পড়ল, ধুলোবালি কিংবা আর-কিছু। মীরা চোখ বন্ধ করে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করছিল—এমন সময় সুরপতি কাছে এসে দাঁড়াল। এ সুরপতি—কী আশ্চর্য, তার অচেনা নয়, বরং বড় বেশী পরিচিত। মীরা চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু সুরপতিকে বুঝতে পারছিল। সুরপতি বলল, জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে। মীরা উঠল। কুয়োর কাছে এসে সুরপতি জল তুলে দিল, মীরা জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করল। সারা মুখ ভিজে গেল। আঁচলে মুখ মুছে মীরা যখন তাকাল—তখনও তার চোখের পাতা ভিজে রয়েছে। কান্না সদ্য সদ্য শুকিয়ে আসার পর যেমন লাগে সেই রকম লাগছিল। মীরা সুরপতির দিকে তাকাল। হাসল। দুজনে কুয়োতলা ছেড়ে বাগানের পিছন দিকে চলে গেল। গাছ-গাছালির তলায় ছায়া জমে আছে। কিছু শুকনো পাতা একপাশে জড় করা। গাছতলায় পাথরের বড় বড় টুকরো পড়েছিল। মীরা বসল। সুরপতি মাটিতে। একটা পাখি পাতাঝোপের মাথার ওপর একদণ্ড বসে হঠাৎ সেই শুকনো পাতার স্তূপের মধ্যে ঝাঁপ খেল। পাখিটাকে আর দেখা গেল না। মীরা খুব অবাক, সুরপতিও। দুজনে তাড়াতাড়ি জমানো শুকনো পাতাগুলোকে সরিয়ে দেবার পর দেখল, পাখিটা আবার উড়ে গেল। দু জনে হাসতে লাগল।..

ঠিক এর পরই মীরা দেখল, সে স্টেশনের প্লাটফর্মে বসে আছে মাথা বাঁচিয়ে, বৃষ্টি পড়ছে। একটা ট্রেন আসছিল। মীরা ঘন ঘন ওভারব্রিজের দিকে তাকাচ্ছে, কিছু লোকজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে, মাথায় ছাতা, হাতে বোঁচকাবুঁচকি। মীরা বড় অস্থির হয়ে পড়ছিল। ট্রেনটা এল, দাঁড়াল। আবার চলে গেল। গাড়ি চলে যাবার পর মীরা দেখল, সুরপতি ওভারব্রিজের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সুরপতি কাছে আসতেই মীরা মুখ ঘুরিয়ে নিল। নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে সোজা হেঁটে অন্য দিকে চলে গেল।...এর পর—মীরা ঠাওর করতে পারল না, কোথায় ব্যাপারটা ঘটেছে—কিন্তু দেখল সুরপতি কোনো বাড়ির বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে একটা আনন্দের হই-হল্লা, কতক-গুলো ছেলে নেচে নেচে খোল বাজাচ্ছে, হঠাৎ ফাগ উড়তে লাগল, পিচকিরির রঙ ছিটিয়ে পড়তে লাগল। সুরপতি হাসতে হাসতে মীরার দিকে এগিয়ে আসছিল। মীরার গায়ে কে রঙ মারল, আবির ছুঁড়ল। মীরা তার জামার মধ্যে থেকে আবির বের করে সুরপতির মাথায় মাখিয়ে দিল। তার পরই

দেখল—সুরপতির মাথা চুঁইয়ে, কান, কপাল গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। মুখ, গলা, ঘাড় বেয়ে রক্ত পড়তে পড়তে জামা ভিজে গেল সুরপতির। মীরা এত রক্ত দেখেনি, সে দিশেহারা হয়ে, ভয় পেয়ে সুরপতিকে কুয়োতলায় নিয়ে যেতে চাইছিল, জল ঢেলে দেবে মাথায়। সুরপতি ততক্ষণে দু হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়েছে।

স্বপ্নটা এইখানে ভেঙে গিয়েছিল। মীরা তখন এতই ভীতার্ত যে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালিয়ে যাবার সময় তার ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নের ভীতি তখনও তাকে অধিকার করে আছে। কয়েক মুহূর্ত পরে মীরা তার জাগরণের মধ্যে অনুভব করল, সুরপতি বাস্তবিকই রক্তপাতে মরে যাচ্ছে না, সে অন্যত্র শুয়ে আছে—ঘুমোচ্ছে। মীরা দুঃস্বপ্ন দেখছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ঘুম এল না।

মীরা এই স্বপ্নকে এবার মনে করতে পারল। মনে করে খুশী হল না। ভোর রাত্রের এই দুঃস্বপ্ন তাকে কি-এক বেদনা এবং অস্বস্তিতে ম্রিয়মাণ করে রাখল।

আরও একটু পরে প্রথম কাকের ডাক শুনল মীরা। ভোর হয়ে এল।

বিছানায় সামান্য সময় শুয়ে থেকে মীরা উঠে পড়ল। ঘরের মধ্যে এখনও তেমন করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এবার একটা চাদর নিল; গায়ে জড়িয়ে বাইরে এল।

একেবারে সাদা সকাল। বৃষ্টির জলের মতন সাদা। কাক, চড়ুই জেগে উঠেছে। কনকনে ভাবটা মুখে নাকে লাগছিল। মীরা এই সকালটাকে হঠাৎ যেন নতুন করে কাছে পেল। মাথায় কানে চাদর জড়িয়ে খাবারের টেবিলের সামনে এসে বসল। সুরপতির ঘর এখান থেকে দেখা যায়। মীরা দেখল। দরজা সেইভাবে খোলা রয়েছে।

স্বপ্নের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দৃশ্য ভেসে গেল আবার। কেন এই স্বপ্ন দেখল মীরা—সে জানে না। কখনও কখনও এই স্বপ্নের কোথাও কোথাও কিছু ছিল যা মীরার ভাল লাগছিল, আবার কোথাও কোথাও বড় দুঃখ ছিল। মীরা আপাতত স্বপ্নটা ভুলে যাবার চেষ্টা করছিল। এ-রকম স্বপ্ন মানুষ কেন দেখে! কোনো কিছুই এর সত্য নয়। সুরপতির সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠতাই মীরার হয় নি। কোনো শত্রুতার সম্পর্কও ছিল না।

ফরসা আরও যেন ঝকঝকে হয়ে উঠছে। রাস্তায় দু-চারটে গলা শোনা যায়। ভোরের বাতাস বুনো ফুলের মতন গন্ধ বয়ে আনছিল। টেবিলে কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসে থাকল মীরা।

নিজের জীবনের কথা মীরা ভাবতে চাইছিল না, তবু খাপছাড়াভাবে তার কিছু কিছু মনে পড়ছিল। আজ যেখানে সে পৌঁছে গিয়েছে এখান থেকে

ফিরে যাবার উপায় নেই। এখন সে প্রমথর বউ। প্রমথর বউ হয়ে তার কোন্ সুখশান্তি জুটেছে মীরা জানে না। তার দুটি সন্তান। রুমকি কিংবা ঝন্টুর জন্যে মীরার আলাদা কোনো আকর্ষণ নেই, যেন মেয়েছেলে হিসেবে সে দুবার গর্ভধারণ করেছিল, অনেকটা নিয়ম মতন, অনেকটা অভ্যাসবশে; এই সংসারে দুটি সন্তানের জন্মদান ছাড়া সে বিশেষ কিছু করেনি। লালন-পালন মা করেছে। রুমকি কাছে নেই, মেয়ের সঙ্গে মীরার সম্পর্কটা দায়ের মতন, মেয়েকে মানুষ করার জন্যে মাসে মাসে টাকা পাঠানো, আর হপ্তায় হপ্তায় চিঠি লেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই। রুমকি কলকাতায় এলে মীরাকে অনেক সময় তটস্থ থাকতে হয়। কলকাতা তার ভাল লাগে না, মার ওপর মেয়ের টান নেই। মীরা বেশ বুঝতে পারে, আরও দু-চার বছর পরে রুমি মার কোনো রকম তোয়াক্কা করবে না। রুমির নিজের মধ্যে এমন একটা স্বভাব গড়ে উঠছে যাতে মীরার সঙ্গে কোনো বন্ধন সে চাইবে না। ঝন্টু যে শেষ পর্যন্ত কী হয়ে উঠবে তাও মীরা জানে না।

ছেলেপুলে থাকা ভাল কি মন্দ তা নিয়ে এখন আর মীরার মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তার তো রয়েছে। মীরা মোটেই মনে করে না, ছেলেপুলেকে নিয়ে জড়িয়ে-জাপটে থাকলেই তার জীবনের সমস্ত সাধ-আশা মিটে যাবে।

সাধ-আশা বলে মীরার কিছু ছিল কি ছিল না—সে কথা আলাদা। তবে এই যে জীবন—প্রমথর বউ হওয়া, রুমি আর ঝন্টুর মা হওয়া—এতে মীরার সাধ-আশা মেটেনি।

নিজের এই বিরক্তিতে মীরা তেমন খুশী হল না। ভোরবেলায় কেন যে এ-সব চিন্তা করছে তাও বুঝল না।

প্রমথ অফিস চলে গিয়েছে। রাধাকে বাজারে পাঠিয়ে মীরা সুরপতির ঘরে এল।

চিঠি লিখছিল সুরপতি, কলম সরিয়ে রেখে মুখ তুলে তাকাল।

মীরা বসল না। সুরপতির দিকে একবার তাকিয়ে জানলার রোদ দেখতে দেখতে বলল, "চা খাবেন?"

"হলে হয়—" সুরপতি বলল, "কটা বাজল?"

"সাড়ে নটা বোধ হয়।" মীরা ঘরের রোদ-আলো ভরা ঝকঝকে চেহারাটা দেখতে লাগল। চায়ের জল সে বসিয়ে এসেছে। প্রমথ অফিস চলে যাবার পর মীরার নিজেরই অভ্যেস চা খাওয়া—সকালের দেড় দু ঘন্টা ব্যস্ততায় কাটে। স্বামী অফিস চলে যাবার পর হঠাৎ যেন সব হালকা লাগে। তখন আলস্য করে কিছুক্ষণ বসে থাকতে, নিজের মতন করে একা বসে বসে চা খেতে ভালই লাগে মীরার।

"আপনার কিছু কাচাকুচি করার রয়েছে?" মীরা জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"থাকলে দিয়ে দেবেন। রাধা একটু বাজার গিয়েছে। ফিরে এসে কাচতে বসবে।"

সুরপতি কিছু বলল না।

মীরাও আর ঘরে দাঁড়িয়ে থাকল না। একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পারল না সে। অথচ সকাল থেকেই ভাবছে, বলব। বলতে গিয়েও কি মনে করে বলতে পারেনি।

দু কাপ চা তৈরী করে ঘরে ঢুকে মীরা দেখল সুরপতির চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেছে। চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে মীরা বলল, "কাল কি আপনি দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন?"

তাকাল সুরপতি। মাথা নাড়ল। "না।"

"না?" মীরা অবাক চোখ করে সুরপতিকে দেখছিল। "না কি—আমি যে সকালবেলায় দেখলাম আপনার ঘরের দরজা খোলা।"

সুরপতি হাসির চোখে তাকাল। "আমি দরজা বন্ধ করে শুই নি। ভেজানো ছিল। হয়ত বাতাসে খুলে গিয়েছিল।"

মীরা কী বলবে বুঝতে পারল না। বিচিত্র মানুষ তো, দরজা খুলে শুয়ে থাকে। একটু পরে বলল, "আশ্চর্য!"

"কেন?"

"দরজা খুলে লোকে রাত্রে শুয়ে থাকে শুনিনি। আমার তো ভয়ই হয়ে গিয়েছিল,—ভাবলাম, আবার বুঝি পালালেন!" মীরা শেষের দিকে কৌতুকের গলা করে বলল।

সুরপতি চা খেতে খেতে বলল, "না বলে আর পালাব না। আপনাদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে একবার বড় অপরাধী হয়েছি।"

মীরা বিছানার দিকে সরে গিয়ে বসল। তার দৃষ্টি চঞ্চল, চোখের তলায় বড় বেশী ব্যাকুলতা রয়েছে। সুরপতিকে মীরা কিছু বুঝতে দিতে চায় না।

যেন নিছকই স্বাভাবিক কৌতূহলবশেই মীরা জানতে চাইছে—এইভাবে বলল, "আপনি বরাবরই দরজা ভেজিয়ে শোন? বন্ধ করেন না?"

সুরপতি মীরার দিকে তাকাল। তার মনে হল, সকালের মীরাকেই আরও বেশী ভাল লাগে দেখতে। মীরার কোনো সজ্জা থাকে না এ-সময়, কোনো চাকচিক্য নয়, সকালের শাড়ি, কেমন একটা বাসী চোখ মুখ, শুকনো চুলের রুক্ষতা, সমস্ত কিছু মিলিয়ে ঘরোয়া চেহারা। মীরাকে সেই রকমই দেখাচ্ছিল, সাদা খোলের শাড়ি, হাল্কা রঙের কয়েকটা ফুল-ছাপ; মাথার বিনুনি খুলে পড়েছে, গায়ের চামড়ায় কোনোরকম আর্দ্রতা নেই।

মীরাকে সুরপতি কয়েক মুহূর্ত দেখল। বলল, "আগে ওইরকম অভ্যাস ছিল।" বলার সময় শ্যামাকে মনে পড়ল সুরপতির। শ্যামা কোনোদিন তাকে দরজা বন্ধ করতে দেয় নি। মাসিমা বেঁচে থাকার সময় নয়, মারা যাবার পরও নয়। রমাও যখন ছিল না, শ্যামা সুরপতিকে নিজের পাশের ঘরে টেনে আনল, তখনও নয়।

"আপনার তাহলে চোর-ছ্যাঁচড়ের ভয় নেই?" মীরা হাসি মুখে বলল. মনে মনে অন্যরকম ভাবছিল।

"এখানে কিসের ভয়?" সুরপতি জবাবে বলল।

"ও কথা বলবেন না। কলকাতা শহরে সবই হয়—" মীরা আরেক চুমুক চা খেল। "ফ্ল্যাট বাড়িতে চুরি-চামারি আরও বেশী।"

"আমার কী চুরি করবে—" সুরপতিও হেসে জবাব দিল, "কিছু নেই। আপনাদের এই ঘরের কিছু চুরি করলে আলাদা কথা।"

মীরা কথা বলল না। বিছানার পায়ের দিকে তাকাল। আবার জানলার দিকে। একটা কালো রঙের পোকা উড়ে এসেছিল। ঘরের মধ্যে উড়ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস গরম হয়ে আসছে, রোদটাও ক্রমশ ঝকঝকে হয়ে গেছে। বেশীক্ষণ তাকানো যায় না। সুরপতিকে বিশ্বাস হচ্ছে না মীরার। সত্যিই কি দরজা খুলে শোওয়া তার অভ্যাস? নাকি সে মিথ্যে কথা বলছে। সুরপতি কি প্রত্যাশায় থাকে না?

একেবারে চুপচাপ কিছু সময় কেটে গেল।

হঠাৎ মীরা সুরপতির দিকে তাকাল। বলল, "আচ্ছা. আপনার সঙ্গে কি আমার—মানে আমাদের বাড়ির কারুর তখন ভাবসাব হয়েছিল?"

—সুরপতি তখনও চা খাচ্ছিল। কোনো রকম ব্যস্ততা দেখাল না। সিগারেট ধরাল। বলল, "না, তেমন আলাপ কারও সঙ্গে হয় নি। আপনার বাবা কখনও কখনও হাটে-বাজারে কথা বলতেন। আর ভাইদের সঙ্গে মুখ চেনা ছিল।"

"আমিও অনেক ভাবলাম, মনে পড়ল না", মীরা বলল; বলার পর তার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল।

সুরপতি অল্প সময় চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "আপনি আমায় চোখেও দেখেন নি—এটা কিন্তু ঠিক নয়।"

"দেখেছি?"

"প্রায় পাশের বাড়িতে ছিলাম—না-দেখার কোনো কারণ নেই।"

"কি জানি, মনেই পড়ছে না।"

সুরপতি আস্তে করে সিগারেট টানল। ধোঁয়া গিলল। মৃদু হেসে বলল, "মনে যখন পড়ছে না—তখন মনে করার চেষ্টা করছেন কেন?"

সাধারণ কথা, তবু মীরা কেমন অপ্রস্তুত বোধ করল। সুরপতির দিকে তাকিয়েই আবার চোখ সরিয়ে নিল। আড়ষ্টভাবে বলল, "না-না-তা নয়। আমার কেমন খারাপ লাগছে। আপনি আমায় এত চেনেন অথচ আমি চিনতে পারছি না। কী অন্যায় কথা!"

আস্তে গলায় সুরপতি বলল, "এত খারাপ লাগার কি আছে?"

মীরা তাকাল। কী বলবে? অনেক কিছুই তো বলতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে, সত্যিই কি আপনি তখন আমার প্রেমে পড়েছিলেন? কই, আমি তো বিন্দুবিসর্গ জানতে পারি নি। কেন পারি নি? কোথায় লুকিয়ে থাকতেন আপনি? আমাকেই বা কেন ভালবাসলেন? কী ছিলাম আমি? দোলের দিন কি আপনি আমাকে, শুধু আমাকেই রঙ দিতে এসেছিলেন? সত্যি, বিশ্বাস করুন—সেদিন ওই ঘটনার পর আমি কতবার আপনার কথা ভেবেছি। জানি না আপনাকে, তবু ভেবেছি। আমার যে কী মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—কত বিশ্রী লেগেছিল আপনাকে আজ কেমন করে বোঝাব! আমারও ছাই—তখনকার কথা কি মনে আছে। নিজে হাত কেটে বিছানায় শুয়ে আছি। প্রথম কদিন কী ভীষণ জ্বর। বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম। তারপর যখন সেরে উঠতে লাগলাম—আপনার কথা আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়ত। আপনার মাথা কাটল, আমার হাত। কিন্তু দুটো ঘটনাই এমনভাবে ঘটল যার দায় যেন আমার। মা বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারতাম না। লজ্জা করত। জিজ্ঞেস করতে গেলেই সেই বজ্জাত নীলেন্দুর কথা এসে পড়বে। তবু সন্তুকে আমি জিজ্ঞেস করেছি চুপিচুপি। সন্তু বলত, ভাল আছেন আপনি। আমি যখন হাত সামলে উঠলাম—তখন আর আপনি নেই। চলে গেছেন।

মীরা চুপ করে থাকতে থাকতে আড়ষ্ট বোধ করল। তারপর বলল, "নিজেকে দোষী দোষী মনে হচ্ছে।"

সুরপতি বলল, "কেন মনে করছেন! দোষের কথা মনে করাতে আমি আসি নি।"

"তা হলে?" মীরা হঠাৎ বলল। বলেই বুঝতে পারল, তার গলার স্বরে কেমন এক আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া—এই প্রশ্নের তো কোনো অর্থ হয় না। মীরা যেন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল, সুরপতি তারই জন্যে এসেছে। নিজের বোকামি আরও অপ্রস্তুত করল।

সুরপতি হেসে বলল, "তা হলে—কিছু নয়।"

"কিছু নয়?"

"কী হতে পারে বলুন। প্রমথ আমায় জোর করে তার বাড়িতে ধরে এনেছিল। বলেছিল, চল, দেখবি চল কেমন আরামে আছি কত সুখে। আসলে বন্ধুকে মানুষ যেভাবে বাড়িতে ধরে আনে সেইভাবেই ধরে এনেছিল। এখানে

এসে আপনাকে দেখলাম। দেখার কথা নয়। তবু দেখলাম।"

মীরার মুখ ময়লা হয়ে আসছিল। ব্যঙ্গের গলায় বলল, "আমাদের সুখ কেমন দেখলেন?"

"দেখলাম।"

"কেমন?"

চুপ করে থেকে সুরপতি বলল, "জীবনে সুখ যে কী আমি বুঝতে পারি না। সুখ যে মানুষ পায় তাও জোর করে বলতে পারি না। আপনারা নিজেরাই জানেন কে কতটা সুখ পেয়েছেন।"

মীরা বসে থাকল। একেবারেই অন্যমনস্ক।

কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়াল হঠাৎ, বলল, "আপনি স্পষ্ট করে কথা বলতে শেখেন নি।...আমি যাই।"

মীরা চায়ের কাপ কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল; যেতে যেতে আচমকা বলল, "রাত্তিরে দরজা বন্ধ করেই শোবেন। খোলা দেখলে অস্বস্তি হয়।"

চোদ্দ

শেষ পর্যন্ত সুরপতি উঠে পড়ল। তার ক্লান্তি লাগছিল। বারান্দা থেকে নেমে গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল। রোদের চেহারাটা পরিষ্কার নয়, যেন ধুলোয় ভরা রোদ গঙ্গার জলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে; চাপা, ময়লা দেখাচ্ছিল। আকাশ-টাও ঘোলাটে।

সুরপতি গাছতলায় বসল। এখন পুরোপুরি দুপুর নয়, অথচ বেলা অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে। সকালের দিকে নটা নাগাদ তারা পলতায় পৌঁছে গিয়েছিল, অন্যরা একে একে এসে জুটলো দশটা সোয়া দশটার মধ্যে। তখন থেকে এতটা বেলা পর্যন্ত গল্পগুজব আড্ডা চলছিল।

অনেককাল পরে সুরপতি পুরোনো বন্ধুদের দেখল। কাউকে কাউকে নজর করে দেখলে চেনা যায় এখনও, কাউকে যায় না। জগবন্ধুকে চেনার উপায় নেই, কৃষ্ণকেও নয়। দুজনে দুরকম চেহারা করে ফেলেছে; জগবন্ধু ভীষণ মোটা হয়ে গিয়েছে, হাঁসফাঁস করে সর্বক্ষণ, মাথায় টাক পড়েছে। কৃষ্ণকে দেখলে মনে হয়, বয়সটা আরও পাঁচ-সাত বছর বাড়িয়ে ফেলেছে, ভাঙা শরীর স্বাস্থ্য, খড়িওঠা ফ্যাকাশে চেহারা, মাথার চুল প্রায় সবই সাদা হয়ে এল। শিশির আর ত্রিদিব তবু পুরোনো কাঠামোর অনেকটা ধরে রাখতে পেরেছে এখনও। দুজনেই মোটামুটি জীবন্ত। অমলকে দেখলে মনে হবে, ওকালতিতে বেচারীর পশার বাড়ল না দেখে যত রাজ্যের বিরক্তি আর হতাশা নিয়ে কেমন খুঁতখুঁতে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বন্ধুদের স্ত্রীর সঙ্গেও সুরপতির আলাপ হল। ত্রিদিবের স্ত্রী প্রণতিকে চতুর, বুদ্ধিমতী বলে মনে হল সুরপতির। শিশিরের বউ সরযূ খোলামেলা ঘরোয়া গিন্নীবান্নি মানুষ। শিশিরের সঙ্গে মানানসই। জগবন্ধুর স্ত্রী শোভাকে জগবন্ধুর পাশে মানায় না; বেচারী রোগাসোগা বেঁটেখাটো মহিলা, সুশ্রী মুখ। জগবন্ধু নিজেই রসিকতা করে বলল—'আমার সাইড্ কার ভাই, টেনে নিয়ে যেতে হয়।' কৃষ্ণর স্ত্রী ছন্দা পাতলা চেহারার মেয়ে, গায়ের রঙ ময়লা, বড় বড় চোখ ছাড়া মুখের অন্য কোনো লাবণ্য নেই, কথা একটু বেশীই বলে। গলাটি বেশ সুরেলা ছন্দার। কেতকী—অমলের স্ত্রী—মোটা-মুটি শান্ত গোছের মানুষ। স্বামীর জন্যে সর্বদাই শশব্যস্ত।

সুরপতি বুঝতে পারছিল, যা পুরোনো—যার আর কোনো জের নেই

তাকে হঠাৎ ফিরে পাওয়া যায় না। বন্ধুদের প্রথম দিককার উচ্ছ্বাস কিংবা খুশী তেমন কিছু স্থায়ী হল না। সকলে প্রমথ নয়। ত্রিদিব কিংবা শিশিরও নয়। পুরোনো দিনের কিছু গল্পগুজবের পর যে যার নিজের অফিস, বড় সাহেব, মাইনে, কোথায় কে জমি কিনছে কি দরে এই সব গল্প নিয়ে পড়ল। সেই সব গল্প শেষ হতে না হতে ডাক্তার ওষুধের গল্প। কিছুক্ষণ রাজনীতি। তারপরই কলকাতার ভিড়-ভাড়াক্কা, জলের কষ্ট, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কথা।

ত্রিদিব কাজের মানুষ। লুকিয়ে হুইস্কি এনেছিল। আড়ালে গিয়ে দু-তিনজনে খানিকটা খেয়ে এল।

সুরপতি এক সময় অনুভব করল, সমস্ত কিছুর মধ্যে কেমন ক্লান্তি এসে গেছে। প্রথম দিকে যে তাপ ছিল তার আঁচ মরে গিয়েছে, গিয়ে ছাই পড়ে আসছে। এই রকমই হয়, দীর্ঘক্ষণ কিছু টেনে নিয়ে যাবার বয়েস কিংবা মন হয়ত আর নেই।

গাছতলায় ছায়ায় বসে সুরপতি গঙ্গার ওপর ছড়ানো ঘোলাটে রোদের দিকে তাকিয়ে থাকল। মাঝে মাঝে বাতাস আসছিল দমকা। তবু এক গুমোট যেন চারপাশে ধীরে ধীরে জমে উঠেছিল।

হাতের সিগারেটটা ফেলে দেবার পর পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল সুরপতি।

মীরা এগিয়ে আসছিল।

কাছে এসে মীরা দাঁড়াল। "আপনি এখানে?"

সুরপতি একটু হাসল। "বসে আছি।"

মীরা দাঁড়িয়েই থাকল, গঙ্গার দিকে তাকাল, আকাশ দেখল। "কেমন লাগছে?"

"মন্দ নয়", সুরপতি বলল, "ক'টা বাজল?"

মীরা হাতের ঘড়ি দেখল। "একটা বেজে গেছে। কেমন গরম লাগছে না?"

মাথা নাড়ল সুরপতি। "গুমোট হয়ে আছে।"

"ক'দিনই মাঝে মাঝে এই রকম হচ্ছে।" মীরা যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে অন্যদিকে বসল। "এবার খেতে যেতে হবে। হয়ে এসেছে সব।"

সুরপতি মীরাকে দেখতে লাগল। ছাপা সিল্কের শাড়ি পরেছে মীরা, চন্দন রঙের জমির ওপর লাল কালোর ফোঁটা, গায়ের জামাটা লাল সমস্ত বাহুই অনাবৃত। মাথায় ভাঙা খোঁপা। মীরাকে দেখতে দেখতে সুরপতির মনে হল, আগেও হয়েছে, প্রমথর স্ত্রীভাগ্য সবচেয়ে ভাল। কোনো সন্দেহ নেই, বন্ধুদের স্ত্রীর মধ্যে মীরাই যথার্থ সুন্দরী; শরীর এবং বয়েসকে একমাত্র মীরাই ধরে রাখতে পেরেছে।

"আপনি আগে কখনও এখানে আসেন নি?" মীরা যেন অন্য কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল।

"না," সুরপতি বলল, "আগে গল্প শুনেছি, আসিনি।"

"আপনার বন্ধুরা অনেকে এসেছে।"

"ত্রিদিবের কাছাকাছি যারা ছিল—কলকাতাতেই—তারা আসতে পারে। আমি থাকলামই না।"

মীরা পা গুটিয়ে বসল। তার একপাশে ঘাস আর শুকনো পাতা। কপালে চুল এসে পড়ছে।

"আগে একবার আমরা ডায়মণ্ড হারবারের দিকে গিয়েছিলাম", মীরা বলল, "শীতকালে। সেবার দল আরও বড় ছিল। আরও অনেকে এসেছিলেন। বাচ্চাকাচ্চাও ছিল।"

"তবে তো খুবই হই-হুল্লোড় হয়েছিল।"

মীরা তাকাল। চুপ করে থাকল দু মুহূর্ত, তারপর বলল, "সত্যি কথা বলব—?"

সুরপতি তাকিয়ে থাকল।

"আমার একেবারেই ভাল লাগে নি," স্পষ্ট গলায় মীরা বলল। "এদের এই হুজুগ আমার ভাল লাগে না। কী হয় এসব হুজুগে মেতে?"

সুরপতি বলল, "কিছু নয় হয়ত, তবু একটু আনন্দ..."

"কত আনন্দ তা আমি জানি—" মীরা বিরক্তভাবে বলল, "আপনার বন্ধুর মতন বোকা আর হুজুগেদের কিছু হয় হয়ত—বাকীদের কিছু হয় না। এখানে এসে পরচর্চা, পরনিন্দা, কে কার চেয়ে বেশী রোজগার করছে—তার গল্পই হয়।"

সুরপতি মীরাকে লক্ষ করছিল। পলতায় আসার কোনো উৎসাহ মীরার ছিল না। নিতান্ত দায়ে পড়ে এসেছে। এসেও কোনো দিকে গা দিচ্ছে না। এই নিস্পৃহতা এবং তিক্ততা মীরার কেন—সুরপতি খানিকটা অনুমান করতে পারছে। মীরাকে কেউ অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করে না। মীরাও কাউকে পছন্দ করে না।

সুরপতি হালকাভাবে হেসে বলল, "হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কি আর করবেন—, ভাল লাগিয়ে নিন।"

মীরা দুহাতে কপালের চুল সরাল। তাকাল সুরপতির দিকে, কেমন যেন বিষণ্ণ হতাশ চোখে, বলল, "ভাল লাগিয়েই এতোকাল কাটল। আর ভাল লাগে না।" মুখ ফিরিয়ে নিল মীরা, মাথা নীচু করে ঘাসের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার গলার স্বর গভীর নিঃশ্বাসের মতন শোনাল, অস্পষ্ট অথচ আন্তরিক।

কথা বলল না সুরপতি। বলা যায় না।

গঙ্গার বাতাস এল দমকা। গাছের পাতার শব্দ হল। বুঝি মেঘ এসেছে আকাশে—ভেসে যাচ্ছে—গাছের ছায়া আরও একটু নিবিড় হল, দূরের ঘোলাটে রোদ ক্রমশই ছায়ায় জড়িয়ে যেতে লাগল। আপন মনে কটা পাখি কোথাও ডেকে যাচ্ছিল। কাঠবেড়ালি নেমেছে পেয়ারাতলায়।

মীরাই আবার কথা বলল, সুরপতির দিকে সরাসরি তাকিয়ে, আচমকা। "একটা কথা বলুন তো সত্যি করে, এই যে এরা আপনাকে নিয়ে এল—আপনার পুরোনো বন্ধুরা, এরা কি আপনাকে দেখে সবাই আহ্লাদে গলে গেছে?"

সুরপতি বিব্রত বোধ করল। বলল, "গল্পটল্প তো হল। একটা কথা কি জানেন—সকলের কাছে সব কিছু চাওয়া যায় না। আমায় নিয়ে সবাই আহ্লাদ করবে এটা আমি আশা করি না। সকলেই কি আর প্রমথ!"

মীরা বলল, "অত ঘুরিয়ে বলার কি আছে, সোজা বলুন—আপনারও ভাল লাগছে না।"

সুরপতি অস্বীকার করল না। বলল, "লাগছে না।"

মীরা কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল। তার চোখ যেন বলল, তা হলে আছি কেন এখানে? তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যত সময় যাবে—ততই দেখবেন আরও খারাপ লাগছে। এদের সঙ্গে বেশীক্ষণ ভাল লাগে না।"

চুপ করে থাকল সুরপতি।

আরও একটু বসে মীরা উঠে পড়ল। ঘাস, মাটি, শুকনো পাতা লেগেছে শাড়িতে। নীচু হয়ে হাত দিয়ে ময়লা ঝাড়ল। তারপর আচমকা বলল, "বাগানটা মস্ত বড়। ওপাশে গঙ্গার দিকটা দেখতে বেশ লাগছে; কেমন বেঁকে গেছে দেখেছেন। দুপুরে একবার দেখে আসব, কি বলেন?"

সুরপতি কিছু বলার আগেই মীরা পা বাড়াল। কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আসুন—খাবার ডাক পড়বে এখুনি।"

মীরা চলে গেল বাগানের মধ্যে দিয়ে। সুরপতি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। তরুকে মনে পড়ল। কতদিন, কত অসংখ্যবার সুরপতি তরুকে বাগান দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যেতে দেখেছে। দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে এক-পা কাটা তরু কত কষ্ট করে চলে যেত। প্রত্যেকবার পা ফেলার সময় তাকে ক্রাচ টানতে হত, পিঠ দুলে উঠত, কোমরের তলার দিকটা ভেঙে-চুরে বেঁকে কেমন বীভৎস হয়ে যেত। মীরা স্বচ্ছন্দে চলে গেল, কোথাও কোনো জড়তা নেই, সামান্য পা টেনে টেনে সুন্দর ভঙ্গি করে হেঁটে চলে গেল। কেন একজন বিকৃত হয় অন্যজন সুন্দর?

তরুরও একটা সৌন্দর্য ছিল। কেমন সৌন্দর্য বোঝানো মুশকিল। হয়ত দীনতার সৌন্দর্য, ব্যথার সৌন্দর্য। মেটে রঙের চেহারা, সরার মতন মুখ,

সুপুষ্ট হাত পিঠ; স্বাভাবিক শক্ত বুক। তরু তার চেহারায় টানত না। তার বিষণ্ণ মুখ, সরল নির্বোধ চোখ, করুণ দৃষ্টি সুরপতিকে টানত। তরুর ভাব-সাব দেখলে মনে হত, নিজেকে সামান্য নৈবেদ্যের মতন সমর্পণ করলেই সে কৃতার্থ হবে। সুরপতি তরুর জন্যে বেদনা বোধ করত। তরুর সঙ্গে সুরপতি প্রেমের সম্পর্ক পাতায় নি। সহানুভূতি ও মমতার চোখেই সে দেখত তরুকে। তরু কী বুঝত সুরপতি জানে না।

তরু যেদিন বৈশাখের তপ্ত দুপুরে খেপা কুকুরের ধাক্কা খেয়ে আম-বাগানের মধ্যে পড়ে গেল, সুরপতি ছুটে তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তরুর একটা ক্রাচ হাত কয়েক দূরে ছিটকে গেছে, অন্যটা মাথার দিকে; কোমরের দিকে কাপড় এলোমেলো হয়ে উঠে গেছে, কাটা পায়ের দিকে কোনো আবরণই নেই, উরুর খানিকটা বেরিয়ে আছে। তামাটে রঙের বিকৃত এক মাংসের স্তূপ। সুরপতি দু মুহূর্ত তাকিয়েছিল। অগোছালো আলগা কাপড়, কাটা উরুর মধ্য দিয়ে নারী-অঙ্গের যে অন্ধকার দেখেছিল সুরপতি—সেই অন্ধকারে বীভৎসতা ও বিকৃতির আঘাত ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

সুরপতি মুখ ফিরিয়ে গঙ্গার দিকে তাকাল। মেঘের ছায়া মাঝ-বরাবর নদী পেরিয়ে চলে গেছে, এ-পারে আবার সেই ঘোলাটে মরা রোদ ফুটল। জুট মিলের নৌকোটৌকো যাচ্ছে বোধ হয়। গাছের পাতা আর কাঁপছে না, শব্দ নেই। পাখিরাও যেন এই গাঢ় গুমোট দুপুরে হঠাৎ সব থেমে গেছে। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা চারপাশে। সুরপতি হঠাৎ অনুভব করল, তরু যেন এখনও কোথাও দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। সুরপতি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

বড় হল ঘরে পুরুষেরা সকলেই শুয়েছিল। মেয়েরা অন্য ঘরে। খাওয়া-দাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে, সিগারেট টানতে টানতে গলপগুজব হয়েছিল কিছুক্ষণ। জগবন্ধু হাঁসফাঁস করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। কৃষ্ণর তন্দ্রা আসছিল। ঝিমুনি ধরে গিয়েছে সকলের। প্রমথ একটা পুরোনো বই যোগাড় করল কোথা থেকে, মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। তারপর নাক ডাকতে লাগল।

সুরপতি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছিল একপাশে। বন্ধুদের আর কোনো গলা পাওয়া যাচ্ছে না; কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ বা তন্দ্রাচ্ছন্ন, কারুর বা নাক ডাকছিল।

এক সময় উঠে পড়ল সুরপতি। বাইরে এল। দুপুর ফুরিয়ে আসার মতন। রোদ একেবারেই ধুলোর রঙ ধরেছে, আলোয় মেঘলার ছায়া মেশানো। জল তেষ্টা পাচ্ছিল। কাছাকাছি কাউকে দেখতে পেল না।

বারান্দা দিয়ে নীচে নেমে এল সুরপতি। ত্রিদিবদের এই বাগানবাড়ি বিশাল কিছু নয়। তবু বড়। দু পুরুষ আগে পয়সা খরচ করে বাগানবাড়ি

বানানোর আর্থিক সচ্ছলতা ও আভিজাত্য ত্রিদিবদের ছিল। এখন এই বাড়ির জীর্ণ দশার মতনই তাদের অবস্থা। তবু কিছু তো রয়েছে। সুরপতি বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াল না, বাগানের দিকে চলে গেল। কলাবাগানের কাছে টিউবওয়েল। বাগানের মালীকেও চোখে পড়ছে না।

টিউবওয়েলের হাতল ওঠানামার শব্দেও কাউকে দেখা গেল না। সুরপতি প্রায় যখন হতাশ হয়ে ফিরে যাবে ভাবছে ঠাকুরকে দেখতে পেল। ডাকল।

জল খেয়ে বাগানের মধ্যে চলে গেল সুরপতি। ত্রিদিবদের এই বাগান-বাড়িতে বাগানের অংশটাই বেশী। অজস্র গাছ। আমগাছই বেশী, কিছু অন্য অন্য ফলের—জাম, পেয়ারা, লিচুর। জঙ্গলও কম নয়। আগাছায় ভরে আছে। হয়ত কোনোকালে সাজানো ফুলবাগান ছিল। এখন ভাঙা ইটের কেয়ারি, প্রচুর ঘাস, কয়েকটা কলাফুল আর সামান্য জবা বই বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। ঝাউয়ের গা জড়িয়ে বুনো লতা উঠেছে।

সুরপতি বাগানের মধ্যে দিয়ে অলসভাবে আর খানিকটা এগিয়ে প্রায় ফটকের কাছে চলে গেল। দাঁড়াল দু দণ্ড, একটা সিগারেট ধরাল, তারপর আবার ফিরতে লাগল।

ফিরে আসার সময় মীরাকে দেখতে পেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

সুরপতিকে দেখামাত্র মীরা হাতের ইশারায় গঙ্গার দিকটা দেখাল। যেন জানতে চাইল—সুরপতি কোন দিকে যাচ্ছে! সুরপতি একটু দাঁড়িয়ে গাছ-পালার ছায়া দিয়ে হাঁটতে লাগল সোজা।

মেঘলা ক্রমশই যেন ঘন হয়ে আসছিল। সমস্ত ছায়াই কালচে হয়ে উঠছে। রোদ নেই, আলো একেবারেই ময়লা। কয়েকটা কাক চিল মাথার ওপর উড়ছে। আদিগন্ত আকাশ থমথমে। নারকোল গাছের মাথাও কাঁপছে না।

সুরপতি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মীরা এল। বলল, "আপনি তাহলে ঘুমোন নি?"

মাথা নাড়ল সুরপতি। "না. আমার ঘুম কম।"

"দুপুরে আমিও শুতে পারি না," মীরা বলল, "অভ্যেস নেই।"

সুরপতি কিছু বলল না।

মীরা বলল, "চলুন, আমরা গঙ্গার ওদিকটায় কোথাও গিয়ে বসি। রোদ তো নেই।"

সামনের দিকে তাকালো সুরপতি। গঙ্গার ডান হাতি গাছপালা রয়েছে। ভাঙা কোনো মন্দির। বলল, "চলুন। একটু গর্তটর্ত থাকতে পারে, লাফাতে হবে।"

মীরা হাঁটতে লাগল। "বিকেল হয়ে গেছে কিন্তু।"

"ঘড়িটা ফেলে এসেছি। ক'টা বাজল?"

"চার।"

"চার?...এরা ফিরবে কখন?"

"জানি না। সন্ধ্যের মুখে।"

"অবস্থাটা কিন্তু ভাল নয়। ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।"

"হলে ভাল, যা গুমোট।"

কখনও কথা বলতে বলতে, কখনও একেবারে চুপচাপ দুজনে হাঁটতে লাগল। বাগান শেষ, ভাঙা পাঁচিল। পাঁচিলের পাশ দিয়ে পথ পাওয়া গেল, সামান্য এগিয়ে খাদ মতন, মাটি আর বালি, ভাঙা কলসি পড়ে আছে। মীরার অসুবিধে হল না।

গঙ্গার পাড় ঘেঁষে মস্ত পাকুড়গাছ, নিম। সুরপতি বলল, "এখানে বসবেন?"

মীরা চারপাশ তাকিয়ে দেখল। গাছের ছায়া বড় নিবিড়। চোরকাঁটায় মাঠ ভরে আছে। শালিখ নেমেছে মাঠে। বলল, "এখানেই বসি।"

মীরাই আগে বসল। সুরপতি বলল, "এখন ভাটা চলেছে। জল দেখছেন?"

মীরা জল দেখতে লাগল। পাড় থেকে বেশ একটু তফাতে জল। সামনেটায় কাদা থিকথিক করছে। জলমাটির গন্ধ উঠছিল। নদীর ঠাণ্ডা বাতাস রয়েছে মৃদু।

সুরপতি বসেছিল। ত্রিদিবদের বাগানবাড়িটা অন্তত দেড়শো দুশ' গজ।

চুপচাপ খানিকটা সময় কেটে গেল। শেষে মীরা বলল, "আমি আজ ক'দিনই একটা কথা ভাবছি—" বলে আবার চুপ করে গেল।

সুরপতি তাকাল। মীরাকেও কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। আকাশের মেঘলা, ময়লা ছায়ার জন্যে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এই রকমই দেখাচ্ছে মীরাকে আজ সারাদিন। হয়ত গতকালও দেখাচ্ছিল।

মীরা সুরপতির চোখে চোখে তাকাল। হঠাৎ বলল, "আমায় ক'টা কথা বলবেন?"

সুরপতি মীরার চোখে কেমন এক অসহিষ্ণুতা দেখল। কী কথা?"

"বলছি। তার আগে একটা কথা আপনাকে বলি", মীরা জোরে নিঃশ্বাস নিল, সামান্য যেন উত্তেজিত, বলল, "আমি ছেলেমানুষ নই, আপনিও নন। আপনি এ ছেলেমানুষি কেন করছেন?"

সুরপতি অবাক হল। তাকিয়ে থাকল। বলল, "ছেলেমানুষি?"

"তা ছাড়া আর কি!"

"কেন?"

মীরা আঁচলের প্রান্ত কোমরে গুঁজল, ডান হাতে কপালের চুল সরাল।

"তা ছাড়া আর কি! সেই কবে আপনি আমাকে দেখেছিলেন, আপনার সঙ্গে আমার ভাবসাব হয়নি, আলাপও নয়—আপনাকে আমি চিনতেও পারছি না। তবু কেন আপনি—" সুরপতির চোখে চোখ পড়তেই মীরা থেমে গেল।

সুরপতি কেমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল—তন্ময়, গভীর, বিষণ্ণ। মীরা ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু কথা বলতেও পারল না।

অনেকক্ষণ সুরপতি কথা বলল না, পরে বলল, "আমায় নিয়ে আপনি বড় বিব্রত বোধ করছেন। অশান্তিতে পড়েছেন।"

"হ্যাঁ", স্পষ্ট করেই মীরা বলল, "আপনার এইভাবে থেকে যাবার আমি কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি বড় আশ্চর্য মানুষ!...ছেলেবেলায় আপনার কাকে ভাল লেগেছিল—সে-গল্প তখন আপনি আপনার বন্ধুদের কাছে করেছেন শুনলাম। কিন্তু এখন আর সে-গল্প মানায় না। মানায়—? আপনি বলুন?"

সুরপতি জবাব দিল না।

অপেক্ষা করে মীরা বলল, "সে-গল্পও যেমন মানায় না, সেই রকম নীলেন্দুর সঙ্গে আমার ভাবসাব ছিল এ-গল্পটা আপনার বন্ধুকে জানিয়ে আপনি আমার কোন্ ক্ষতি করবেন! আপনার বন্ধুকে আমি গ্রাহ্য করি না। সে অনেক বেশী পেয়েছে। আমি কিছুই পাইনি।"

সুরপতি বলল, "প্রমথ আমার বন্ধু। ও আমায় ভালবাসে। একমাত্র ও। আমি ওর খানিকটা নিশ্চয় বুঝতে পারি। নীলেন্দুর গল্প আমি ওকে কেন বলব! বলেই বা কোন লাভ হবে। প্রমথও তো আপনাকে চেনে।"

মীরা ঘাড় ফেরাল। ভুরু কোঁচকাল। "মানে?"

সুরপতি বলল, "কথাটা আপনাদের। আপনারাই বুঝবেন। স্বামী-স্ত্রী হয়ে জীবন কাটালেই মানুষ সুখী হয় না।"

মীরা কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। বলল, "আপনি কি আমাদের সুখী করতে এসেছেন?"

"না।"

"তাহলে কেন এসেছেন? আমায় দেখতে? ছেলেমানুষি করতে?"

"হয়ত তাই। আপনাকেই দেখতে এসেছি।"

মীরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে সুরপতির দিকে তাকিয়ে থাকল। কয়েক মুহূর্ত যেন কেমন চেতনার কোনো অজ্ঞাত গভীরে ডুবে গেল। ঘূর্ণির মতন অতীতের কয়েকটা স্মৃতি পাক খেল, পাক খেয়ে শুকনো পাতা যেমন উড়ে যায়—কোথায় হারিয়ে গেল। মীরা আবার যখন সচেতন হ'ল, অনুভব করল—চারপাশের গুমোট গরম বাতাস তার নাকে চোখে লাগছে। সুরপতির দিকে তাকাতে পারল না মীরা। নদীর দিকে তাকাল। জলের ওপর ছায়া আরও কালো

হয়ে এসেছে কখন।

মীরার হঠাৎ কেমন কষ্ট এল বুকে, যেন এই কষ্টে হৃদয় ভেঙে যায়, কোনো হাহাকার গুমরে ওঠে। সর্বাঙ্গে এমন এক অনুভূতি এল, মনে হল, কোনো আবেগে সে কেঁপে উঠছে।

চোখ ফিরিয়ে মীরা বলল, "আমায় দেখার কী আছে বলুন! আমি তো—"

সুরপতি বলল, "কী আছে সেটা আমিও খুঁজেছি।"

"মিছেমিছি খুঁজেছেন।"

"আপনিও খুঁজেছেন।"

"আমি?" মীরা সুরপতির দিকে তাকাল।

সুরপতি বলল, "যদি না খুঁজবেন—তবে কেন কাল রাত্রে আপনি আমার ঘরে গিয়েছিলেন?"

মীরার মুখ বিবর্ণ হল, চোখের পাতা পড়ল না গলাও যেন শুকিয়ে গেল। নিস্তব্ধ, নিঃসাড় হয়ে বসে থাকল।

অনেক পরে মীরা বলল, "আপনি কি জেগে ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"মাঝরাতেও?"

"ছিলাম।"

মীরা কিছু বলতে পারল না। গত রাত্রেও সে যেন কোনো আচ্ছন্ন ঘোরে সুরপতির ঘরে গিয়েছিল। দরজা খুলেই রেখেছিল সুরপতি। মীরা অন্ধকারে চোরের মতন সুরপতির বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। ভেবেছিল সুরপতি ঘুমিয়ে আছে। মীরার যখন কান্না এল আচমকা, ফুঁপিয়ে ওঠার মতন শব্দ হল গলায়, সে আর দাঁড়ায় নি। চলে এসেছিল। বারান্দায় বসে একা একা—শীতের মধ্যরাত্রে মীরা কেঁদেছিল। কেন কেঁদেছিল সে জানে না।

মীরা দু হাতে মুখ ঢেকে মাথা নীচু করে বসে থাকল।

সুরপতিও বসে থাকল। নদীর জলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ আকাশের দিকে চোখ পড়ল। হু হু করে কালো মেঘ ভেসে আসছে। দমকা বাতাস দিল। মাঠ-ঘাট বাগান নদী থেকে যেন কোনো ভীষণ ঝড় ছুটে আসছে।

সুরপতি বলল, "ঝড় আসছে।"

মীরা উঠল না, বসে থাকল।

আচমকা গুমোট যেন সিসের মতন ভারী হল। সুরপতি ঘামতে লাগল। তারপরই ঝড়ের বাতাস এল। ধুলো মাটি পাতা উড়ে আসতে লাগল বৃষ্টির গন্ধ নিয়ে।

সুরপতি বলল, "উঠুন। ঝড় এসে গেছে। বৃষ্টিও আসছে।"

মীরা উঠল।

বাগানবাড়ির কাছাকাছিও পেঁাছনো গেল না। বৃষ্টি এসে গেল।

প্রায় ছুটতে ছুটতে ভাঙা মন্দির মতন জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। মীরা হাঁপাচ্ছিল, সুরপতি হাঁ করে শ্বাস টানছিল। ঝড়ে মাথামাথি হয়ে গেছে দুজনেই। বৃষ্টির জল মীরার মাথা ভিজিয়ে দিয়েছে, কাপড়চোপড়ও। সুরপতিও শুকনো নয়।

মীরা বলল, "কী জোর বৃষ্টি নামল।"

সুরপতি দেখল, চারপাশ কালো করে প্রবল বৃষ্টি নেমেছে।

পনেরো

দরজা খুলে ঘরের আলো জ্বালল মীরা; সুরপতির দিকে তাকাল। বলল, "জামা কাপড় ছেড়ে নিন তাড়াতাড়ি!"

সুরপতি মীরাকে দেখছিল। প্রায় সর্বাঙ্গই ভেজা মীরার। বলল, "আপনি?"

"আপনি আগে সেরে নিন, আমার একটু দেরী হবে বাথরুমে।" বলে মীরা আর দাঁড়াল না, বাইরে বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল।

নিজের ঘরে এল সুরপতি, আলো জ্বালল। জানলাগুলো সকাল থেকেই বন্ধ। দরজাও বন্ধ ছিল। ঘরের মধ্যে সারাদিনের বন্ধ বাতাসের গন্ধ ও গুমোট। সুরপতি দুটো জানলা খুলে দিল। ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস এল হু হু করে। এদিকে বুঝি এবার বৃষ্টি আসার পালা। মেঘ ডাকছে।

সুরপতি শুকনো পাজামা, গেঞ্জি নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

মুখ হাত ধুয়ে, মাথা গা মুছে পোশাক বদলাবার সময় সুরপতির সেই একই রকম পুরোনো অস্বস্তি হচ্ছিল। এই তিন চার ঘন্টার মধ্যে কিছু যেন একটা ঘটে গেছে, পলতার বাগানবাড়িতে যে ঝড়-বৃষ্টি এসেছিল—সুর পতি বুঝতে পারছে না—সেই দুর্যোগ কোথাও কিছু ঘটিয়ে দিয়ে গেছে কিনা, কিন্তু তার অস্বস্তি হচ্ছিল। কোনো মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব নয়, একটা ঝড় আচমকা উঠে এলে কতক্ষণ চলবে, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলেও কতক্ষণ তা স্থায়ী হবে। সুরপতি হিসেব করে সঠিক বলতে পারবে না—কতক্ষণ টানা ঝড় বৃষ্টি চলেছিল। ঘন্টাখানেক কি তার বেশীও হতে পারে। কখনও ঝড় কিছুটা কমেছে, বৃষ্টি বেড়েছে, কখনও বৃষ্টি কমেছে, ঝড় বেড়েছে। শেষ বিকেলেই সব ঘনঘোর হয়ে গেল। কাঠ কয়লার আঁচড়ে আঁকা ছবির মতন আকাশ, জল, মাটি, গাছপালা। সব কালো হয়ে বৃষ্টিতে একাকার হয়ে যাচ্ছিল, ঝড়ে গাছপালা তছনছ হচ্ছিল। বিদ্যুৎ চমক আর বজ্রপাত মীরাকে এত ভীতার্ত করছিল যে সেই ছোট ভাঙা মন্দিরের চাতালে মীরা প্রায় সর্বক্ষণ সুরপতিকে আঁকড়ে ধরে রাখছিল।

মীরা আর সুরপতি যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এল তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, বাতাস দিচ্ছে দমকা, দু জনেই ঝড়ে জলে ভিজে গিয়েছে, বাগানে

জলকাদা, ঝিঁঝি ডাকছে, মাথার ওপর দিয়ে কালো মেঘ ভেসে যাচ্ছে হুহু করে।

বাগান বাড়ির বারান্দায় প্রমথরা সকলে দাঁড়িয়ে ছিল, উদ্বেগ আর আশঙ্কা নিয়ে; মেয়েরাও ব্যস্ত, উৎকণ্ঠ। বিরক্ত।

সুরপতিরা সামনে আসতেই প্রমথরা তাদের দেখল। প্রায় সর্বাঙ্গ-সিক্ত এই দুটি মানষকে আগ্রহ, কৌতূহল, বিস্ময়, সন্দিগ্ধ চোখে সকলেই কেমন লক্ষ করতে লাগল। চাপা ধিক্কার ও বিদ্রূপও যে না ছিল এমন নয়। মীরাকেই যেন আরও নজর করে দেখছিল সকলে। মীরার পিঠের দিক যদি বা সামান্য কম ভিজেছে সামনের দিকটা ভিজে সপসপ করছিল, শাড়ি জামা গায়ে লেপটে রয়েছে, জল পড়ছে পায়ের দিকে।

প্রমথ একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে মীরার চোখে চোখে তাকাল। তারপর সুরপতিকে বলল, 'কী ব্যাপার?'

সুরপতি বলল, 'গঙ্গার দিকে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি এসে গেল।'

প্রমথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল।

মেয়েরা বারান্দার খানিকটা ভেতর দিকে দাঁড়িয়ে আছে। পুরোনো একটা লণ্ঠন জ্বলছিল দোর গোড়ায়। থমথমে ভাব জমে উঠেছে। মীরার দিকে আর কেউ সরাসরি তাকাচ্ছিল না। অবস্থাটা অস্বস্তিদায়ক।

শিশিরই কথা বলল, 'তোরা আমাদের ভীষণ ঘাবড়ে দিয়েছিলি। যে-রকম ঝড় জল! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেল আমার। শুনতে পাস নি?'

মাথা নাড়ল সুরপতি। 'আমরা মাথা বাঁচাতে ওদিকে একটা ভাঙা ইটের মন্দিরে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'বেশ করেছিলি। তাড়াতাড়ি নে; স্টার্ট করব। এখন একটু ঢিলে রয়েছে, আবার কখন ঝেঁপে আসবে।'

শিশিরের বউ মীরাকে গা-মাথা মুছে নিতে বলল।

একটু পরেই বাগানবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই। প্রমথ আর ত্রিদিব গাড়িতে এল না। তারা জগবন্ধুদের সঙ্গে স্টেশন যাবে, অমলও রয়েছে, ওদিক দিয়ে ফিরবে। বেশীর ভাগ মেয়েরাই শিশিরের সঙ্গে গাড়িতে ফিরে যাবে। সেটাই সুবিধের।

ফেরার পথে গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে শিশির আর সুরপতি। পেছনে মীরা, প্রণতি, ছন্দা, শিশিরের বউ আর কিছু ধোওয়া-মোছা বাসন।

শিশির যেন কোনো অস্বাভাবিক আবহাওয়া হালকা করার জন্যে এলোমেলো কথা বলছিল : কখনও মজার কথা বলার চেষ্টা করছিল, কখনও কোনো পুরোনো গল্প বলছিল, মেয়েদের সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা তামাশার কথা বলছিল। সুরপতি প্রায় চুপচাপ। তার শীত করছিল। পেছনে মেয়েরাও

বড় কথা বলছে না। মীরা কেমন জেদীর মতন বসে, কথাও বলছে না, গ্রাহ্যও করছে না কাউকে।

কলকাতায় পৌঁছবার পথে চারদিকের অবস্থা দেখে মনে হল, আজকের ঝড়বৃষ্টির আয়োজনটা সামান্য ছিল না। কোথাও বৃষ্টি হয়েছে, কোথাও হয়নি—আঁধি উড়ে গিয়ে এই সন্ধ্যের মুখে সব ঘোলাটে করে রেখেছে, বাতাসে ধুলো জমে আছে। মেঘ রয়েছে আকাশ জুড়ে। সোঁদা গন্ধ দিচ্ছে কোথাও কোথাও। কলকাতায় পেঁাছে বোঝা গেল, এদিকেও ঝড়বৃষ্টি আসতে পারে।

মীরাদের বাড়ির কাছে নামিয়ে শিশির চলে যাবার পর সুরপতি দেখল, এদিকের আকাশও ঘটা করে সেজেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে। রাস্তার বাতিগুলো যে কোনো মুহূর্তে নিবে যেতে পারে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মীরা বলল, 'আপনার শীত করছে?'

সুরপতি শীতটা সামলে, নিয়েছিল, বলল, 'না। আপনিই বেশী ভিজেছেন।'

'একদিন তো—! কী হয়েছে!'

মীরা আর কিছু বলল না। রাধাকেও ডাকল না নীচে থেকে। ঘরেব চাবি খুলল।

সুরপতি ঘরে একলাই বসেছিল। এদিকে এখনও জোর বৃষ্টি নামে নি। ঝিরঝিরে এক পশলা বৃষ্টির পর থেমে গেছে। ধুলোর গন্ধও আর ছিল না। দূরান্ত কোনো বৃষ্টির ভিজে বাতাস বয়ে আসছিল। সামান্য গা সিরসিব করে ওঠায় জানলা বন্ধ করে দিল সুরপতি। মাথাটা ধরে উঠছে।

আরও খানিকটা পরে মীরা এল। মাথার চুল এলো, পিঠের দিকে ছড়ানো। একেবারে সাদা শাড়ি পরেছে, সদ্য পাট ভাঙা, কালো পাড়। গায়ের জামাটাও সাদা। মুখ চোখ পরিষ্কার, ধবধবে, কোনো প্রসাধন নেই। কেমন একটা আর্দ্র স্নিগ্ধ ভাব তাকে জড়িয়ে রয়েছে।

চা করে এনেছিল মীবা। দুজনের জন্যেই। বলল, "নিন, চা খান—, বিকেলে তো চা খেতে পান নি। শুধুই ভিজেছেন।"

মীরার গলার স্বর সামান্য ভাঙা শোনাল। ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।

সুরপতি চা নিল। বলল, "আবার কি স্নান করলেন?"

"না! আবার—!" মীরা বাঁ হাতে মাথার ছড়ানো চুল কাঁধের পাশ থেকে সরাল। গলায় শব্দ করল—ঠাণ্ডায় গলা জ্বালা করছে। টাগরার কাছে শব্দ হল।

সুরপতি চায়ে চুমুক দিয়ে আরাম পেল। মাথাটা ধরে আসছে। হয়ত চায়ের পর ছেড়ে যাবে।

মীরাও চা খেতে লাগল। সে বিছানায় বসেছে।

"এদিকেও ভাল বৃষ্টি হবে," সুরপতি অন্যমনস্কভাবে বলল।

মীরা এমন করে চোখ তুলল যেন বৃষ্টি সে দেখেই এসেছে।

খুঁজে পেতে সুরপতি ঘরে সিগারেটের প্যাকেট পেয়েছিল একটা। গোটা পাঁচেক রয়েছে এখনও। সিগারেট ধরাল। "ক'টা বাজল এখন?"

"প্রায় আট।"

"প্রমথ ফিরতে রাত করলে ভিজবে।"

"বলল তো পরে ফিরবে। বন্ধুদের সঙ্গে রয়েছে।" মীরা উদাসীন গলায় বলল।

সিগারেটের ধোঁয়া চোখে লেগেছিল সুরপতির, ডান চোখের পাতা বুজে এল, ছলছল করল সামান্য। প্রমথ কী অসন্তুষ্ট হয়েছে? বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাকে। কথাও বলে নি বড় একটা। মীরা না সুরপতি—কার ওপর সে বিরক্ত? না দুজনের ওপরেই? সুরপতির আবার বাগানবাড়ির সেই দৃশ্য মনে পড়ল। অস্বস্তি বোধ করল সে।

মীরা জিব আর টাগরায় শব্দ করে গলা চুলকোলো। তারপর তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে বার কয় জোরে জোরে হাঁচল। বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল আচমকা, ঠিক যেন অজস্র গাছের পাতা বাতাসের দমকায় কেঁপে উঠল শব্দ করে।

মীরা নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, "ঠাণ্ডাই লেগে গেল বোধ হয়।...এ-বয়েসে ভেজাভিজির শাস্তি...। দিন আপনার কাপটা দিন—চা আরও রয়েছে; নিয়ে আসি।"

সুরপতি চায়ের কাপ এগিয়ে দেবার আগেই মীরা উঠে দাঁড়াল।

এদিকেও বৃষ্টি নামল। শেষ শীতের এই ঝড় জল অল্প শীত এনেছে। রাত্রে হয়ত ঠাণ্ডা বাড়বে। সুরপতি কান পেতে জানলায় বৃষ্টির ঝাপটা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আজকের বিকেলটা কে কোথায় সাজিয়ে রেখেছিল—কেমন করে এসে গেল আচমকা কে জানে! মাঝে মাঝে সুরপতির মনে হয়, কে যেন—যাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না—সেই মানুষটা সমস্ত কিছু সাজিয়ে রাখে জীবনের। আজও রেখেছিল। নয়ত কেমন করে মীরা আর সুরপতি মন্দিরে দাঁড়িয়ে এক তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে ভিজে এল। ইটের ভাঙা মন্দিরটা নিতান্তই ছোট, ওটা মন্দির ছিল না, অন্য কিছু তাও বলা মুশকিল। ইটের স্তূপ বললেও বলা যায়। মাথার ওপর সামান্য আচ্ছাদন ছিল এই যা রক্ষে। মীরা, যাকে সুরপতি প্রমথর বউ হিসেবে আজ ক'দিন নিতাই দেখছে—সেই মীরাকে তখন বোঝা যাচ্ছিল না। কিছু একটা হয়েছিল মীরার, দুর্যোগের ভীতি শুধু নয়, যে বিহ্বলতা

মানুষকে বোধহীন করে—তেমন কিছু। সুরপতি অনুভব করছিল—মীরা যেন কোনো গভীর সান্নিধ্যের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ছিল। এই ব্যাকুলতার জন্যেই কিনা—যার কিছু অবশিষ্ট মীরার চোখে মুখে লেগে ছিল—প্রমথর চোখে পড়েছে। সুরপতি বুঝতে পারছে না, প্রমথ তার স্ত্রীর সিক্তবাস এবং চোখমুখের চেহারা দেখে কিছু সন্দেহ করেছে কিনা! অন্যদের দৃষ্টিও সুরপতির পছন্দ হয়নি।

চা নিয়ে মীরা আবার এল। সুরপতি কপালে হাত রেখে চোখ বুজে বসে ছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলল।

চা দিয়ে মীরা সামনেই দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য, তারপর বিছানায় গিয়ে বসল। বলল, "কী ভাবছেন?" মীরা গায়ে চাদর নিয়েছে এবার।

"না, কি আর...!"

"অত ভাবনার কিছু নেই", মীরা কেমন উপেক্ষার গলায় বলল। নিজের জন্যেও আবার চা এনেছে।

বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে সুরপতি বলল, "প্রমথ আবার বৃষ্টিব মধ্যে পড়ল।"

মীরা সুরপতিকে লক্ষ করছিল; বলল, "আপনাব দুশ্চিন্তা বন্ধুকে নিয়ে, না অন্য কিছু?"

সুরপতি মীরার গলার চাপা বিদ্রূপ এবং ঈষৎ ঝাঝ বুঝতে পারল। বলল, "প্রমথ বোধ হয় অসন্তুষ্ট হয়েছে।"

"কেন হবে?" মীরা শক্ত স্পষ্ট গলায় বলল, "বাড়িতে যে তার বউকে চব্বিশ ঘন্টা বন্ধুর কাছে ছেড়ে রেখে যেতে পাবে—বাইরে এক দু' ঘন্টা সে বউকে বন্ধুব সঙ্গে মিশতে দিতে পারে না?"

সুরপতি চুপ করেই থাকল।

অপেক্ষা করে মীরা বলল, "আপনার বন্ধুকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।"

সুরপতি নীরব।

বৃষ্টির শব্দ ছাড়া সারা বাড়িতে অন্য কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেমন নীরবতা অন্তঃস্রোতের মতন বয়ে যাচ্ছিল। সুবপতি আর মীরাকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলছিল। কিছু সময় কেউ কোনো কথা বলল না, মীবাই প্রথমে অধৈর্য হল, বিছানার ওপর বাঁ হাত বেখে চাদরে হাত বোলাতে বোলাতে নিজের ভাঙা ছায়া দেখল, মুখ ফিরিয়ে নিল, তাকাল সুবপতিব দিকে। সুরপতি নিঃসাড় বসে আছে। বৃষ্টির সেই একই রকম শব্দ।

মীরা যেন সহসা কোনো ঘোর থেকে জেগে উঠল। হাতের কাপ নামিযে রেখে গলায় শব্দ করল। বলল, "একটা কথা আজ জিজ্ঞেস করি। করব?"

সুরপতি সচেতন হল না পুরোপুরি, অন্যমনস্কভাবেই বলল, 'বলুন?"

মীরা কোলের ওপর হাত জড় করল। পা কেঁপে উঠল সামান্য। বলল, "সেই কবে কী ঘটেছিল, আমার কাছে তো কেমন ছেলেমানুষিই মনে হচ্ছে, সেই জের কি আপনি এখনও সত্যি সত্যি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন?"

সুরপতি মীরার চোখের তারায় চোখ রেখে নির্বাক থাকল। পরে বলল, "আমরা কে যে কোন্ জেরটা টেনে নিয়ে যাই, জানি না।"

"ও কি কথা হল কোনো?"

"কেন?"

মীরা কোনো রকম অপ্রস্তুত বোধ না করে বলল, "আমায় কবে ভাল লেগেছিল আপনার সেটা মনে রেখে আপনি জীবন কাটাবেন এ আমি বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস করার কথাও নয়।"

"তবে?"

"আমার জীবনের দু একটা টুকরো কথা হয়ত আপনি জানেন, তা থেকে কেমন করে বুঝবেন..."

মীরা কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলল, "আপনার কথাই বলুন, শুনি।"

"কী হবে বলে!"

"আপনি নাকি বন্ধুকেও কিছু বলতে চান না। কেন?"

"বলার কিছু নেই", সুরপতি ম্লান হেসে বলল, "মামুলি মানুষ। পেটের ধান্ধায় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কখনো দু পয়সা বেশী রোজগার হয়েছে খেটেখুটে। কখনও কম। এইভাবেই কেটে গেছে।"

"আপনার পেট চালানোর গল্প তো আমি জানতে চাইছি না—," মীরা বলল, "খাওয়া-পরার গল্প শুনে আমার কী হবে!"

"তবে?"

মীরা একটু চুপ করে থেকে বলল, "বলব?"

"বলুন?"

"আপনার ভালবাসার কথাই বলুন—," মীরা যেন সামান্য লঘু গলায় বলল। পরিহাস-ছলে।

সুরপতি কোনো রকম অস্বস্তি প্রকাশ করল না। মীরাকে দেখতে দেখতে বলল, "সে-গল্পও বলার মতন নয়।"

"কেন?"

"আমি নিজেই বুঝলাম না।"

"কী বুঝলেন না? ভালবাসা কাকে বলে—?" মীরা ঠোঁট টিপে হাসল।

"তা ঠিক, কাকেই বা বলে," সুরপতি বলল।

মীরা যেন গলা পর্যন্ত কোনো কথা টেনে এনেছিল, নামিয়ে ফেলল; সুরপতিকে পরিষ্কার চোখে দেখতে লাগল। শেষে বলল, "আজ দুপুরে আপনি অন্য কথা বলেছেন।" মুখের হাসি মুছে গেল মীরার।

"কোন কথা?"

"আপনি বলেছিলেন, আমায় দেখতে এসেছিলেন।"

সুরপতি কথা বলল না। মীরার দিকেও চোখ নেই। মাথার চুল টানল, চোখ বন্ধ করল, মুখের ওপর হাত বুলিয়ে নিল। যেন ক্লান্ত লাগছে এই-ভাবে একটা সিগারেট ধরাল।

মীরা অধৈর্য হয়ে বলল, "বলুন।"

সুরপতি মীরার দিকে তাকাল। বলল, "আপনাকে ঠিক দেখতে আসিনি। এখানে হঠাৎ এসে পড়ে দেখেছি। না দেখারই কথা, তবু দেখলাম।"

"দেখে কী মনে হল?"

এক মুখ ধোঁয়া টেনে নিল সুরপতি। বুকে গলায় লাগল। পরে বলল, "আমার মতনই।"

অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে মীরা বলল, "আপনার মতনই! মানে?"

"একই রকম। কোনো একটা অভাব নিয়ে আমাদের কেটে গেল।" সুর-পতি মৃদু, এলোমেলো গলায় বলল, "প্রমথ আপনার ভালবাসার মানুষ নয়।"

মাথা নাড়ল মীরা। "না, এরা কেউ আমার ভালবাসার লোক নয়।"

"নীলেন্দুও ছিল না," সুরপতি বলল, "আমিও নয়।"

মীরা স্থির চোখে চেয়ে থাকল।

সুরপতি বলল, "কাল রাত্রে আপনি আমার ঘরে এসেছিলেন আমি জানি।" বলে দরজার দিকে তাকাল, চুপ করে থাকল কয়েক দণ্ড, আবার বলল, "এ-বাড়িতে আসার পর থেকে আমার কেমন মনে হয়েছিল একদিন না একদিন আপনি আসতে পারেন। কেন মনে হয়েছিল জিজ্ঞেস করবেন না। হয়েছিল। হয়ত নিজের সংগে আমি বাজি লড়ছিলাম। দরজা খুলে রেখে শোবার অভ্যেস এখন আর আমার নেই। আগে ছিল। শ্যামা আমায় দরজা বন্ধ করে শুতে দিত না।" সুরপতি যেন কিছু ভেবে ইচ্ছে করেই শ্যামার নামটা বলল।

মীরা কৌতূহল ও আগ্রহের চোখে সুরপতিকে দেখল। "শ্যামা আপনার স্ত্রী?"

"না; বোন। মাসতুতো বোন। বেনারসে থাকত।"

মীরা যেন দ্বিধা বোধ করছিল, বুঝতে পারছিল না, শ্যামা কেন সুর-পতিকে দরজা বন্ধ করে শুতে দিত না। সুরপতির বুকের অসুখের জন্যে? ভয় পেত? "শুতে দিত না কেন? অসুখের জন্যে?"

মাথা নাড়ল সুরপতি। "অসুখ ঠিক নয়; তবু বলতে পারেন অসুখ।"

সুরপতি বুঝতে পারল না—হঠাৎ কেন সে কথা বলার সময় সহজ বোধ করছে। নিজের কথা বলতে তার আর অনাগ্রহ নেই, দ্বিধা নেই; বরং কোনো তাড়নায় বা ইচ্ছায় সে যেন স্বেচ্ছায় সমস্ত কথাই বলতে চায়। সিগারেটটা আঙুলে রেখেই সুরপতি বলল, "আমরা অনেকেই একটা অসুখ নিয়ে বেঁচে থাকি। কোনো না কোনো রকমের। শ্যামারও ছিল। আমারও। রমাও তো অসুখ নিয়ে ছিল। তরু।"

মীরা ভীষণ অবাক হয়ে যাচ্ছিল। শ্যামা, রমা, তরু...এরা কারা? সুরপতি কাদের কথা বলছে? কিসের সম্পর্ক তার এদের সঙ্গে? চোখের ভুরু ঘন হয়ে এল মীরার, জোড়া ভুরু কুঁচকে এল, দৃষ্টি তীক্ষ্ন হল। বলল, "এরাও কি আপনার বোন?"

সুরপতি বলল, "রমা শ্যামার বড় বোন। তরু গ্রামের মেয়ে। আমি কিছুদিন মুর্শিদাবাদের দিকে স্কুল মাস্টারী করেছিলাম। তরু আমার বাড়ির কাছেই থাকত। একটা পা ছিল না। কাটা ছিল।"

মীরা কেমন অপ্রসন্ন হল। তার চোখ মুখ গম্ভীর। বলল, "আপনার স্ত্রী কে?"

"এরা কেউ নয়। আমার স্ত্রীর নাম ছিল বকুল।"

মীরা দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "অনেক মেয়েকেই তো আপনি তা হলে চিনতেন।" মীরার গলার স্বরে ধার ছিল, হয়ত বিদ্রূপও।

সিগারেটটা ফেলে দিল সুরপতি। হঠাৎ নেশা হয়ে গেলে যেমন হয়, সুরপতি কেমন একটা ঝোঁক ও অদ্ভুত আবেগ বোধ করতে লাগল। বলল, "আপনি আমার কাছে ভালবাসার গল্প শুনতে চেয়েছিলেন, আমার জীবনের। এরা কেউ আমার পুরোপুরি ভালবাসার মানুষ নয়, তবু এরা ছিল, জীবনে এসেছিল। যেমন নীলেন্দুরা কিংবা প্রমথ আপনার এসেছে।"

মীরার চোখমুখ গরম হয়ে উঠল হঠাৎ। সুরপতি কি তাকে অপমান করছে? চোখের মধ্যে জ্বালা জ্বালা করে উঠল। "এরা তবে আপনার আধা-আধি ভালবাসার মানুষ?"

"বোধ হয় সকলে তাও নয়—" সুরপতি বলল। "তরু ছিল গ্রাম্য, সরল, সাধারণ। তার কাছে মায়া-যত্ন ছিল। কিন্তু মেয়েদের শরীরের কোনো কোনো খুঁত পুরুষমানুষ পছন্দ করে না। তরুর একটা পা কাটা ছিল, কোমর থেকে ঝুলত। বেচারী তরু। কিন্তু পা-কাটা মেয়ে নিয়ে জীবন কাটানো যায় না।" বলতে বলতে সুরপতি চোখ বন্ধ করল। সেই বৈশাখ দুপুরের আমবাগানের ছবি যেন তার চোখের সামনে খুলে পড়ল। কোনো সন্দেহ নেই সুরপতি সেদিন তরুর নগ্ন প্রত্যঙ্গের, পুরুষের পক্ষে যা মোহের এবং প্রয়োজনের—তার কাছাকাছি এই বিকৃতি বীভৎসতা সহ্য করতে পারেনি। তার ঘৃণা হয়ে-

ছিল। তরুর কোনো দোষ নেই। কিন্তু এই বীভৎসতাকে উপেক্ষা করে সুরপতি তরুকে নিত্য শয্যাসঙ্গিনী করতে পারত না।

সুরপতি বলল, "তরুর ছিল পা-কাটা; আর রমার ছিল অন্য অসুখ। তার কী হয়েছিল জানি না—অমন ধবধবে ফরসা রঙ ধীরে ধীরে নীল দাগে ভরে উঠছিল। কালশিটে পড়ে যেমন নীল থেকে কালো হয়ে আসে সেই রকম। হাত পা গলা মুখ দাগে দাগে ভরে গেল। রমা চেয়েছিল দাগগুলো ঢেকে রাখবে। রমা তার শরীর মন সবই ঢেকে রাখতে চেয়েছিল। নিজেকে আড়াল করার লুকিয়ে রাখার এই প্রাণপণ চেষ্টা তাকে কিই বা দিল। রমাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হল। ও আমায় কোনোদিন কিছু বুঝতে দেয়নি। আমায় হয়ত ভালবাসত। বুঝিনি। যদি বা বুঝতে দিত তবু কি জানি..."

মীরা বলল, "আপনি ভালবাসতে পারতেন না। শরীরের খুঁতের জন্যে।"

"না, রমার অসুখ শুধু গায়ের চামড়ায় নয়; মনেরও।"

"মনেরও?"

"ওর কোনো প্রকাশ ছিল না। জীবনের কোথাও কোনো প্রকাশ থাকবে না—সুখের নয়—দুঃখের নয়, ভালবাসার নয়, ঘৃণার নয়—তেমন মানুষ নিয়ে আমি কী করব! সাংসারিক জীবন শুধু নয়—মানুষের সমস্ত অনুভব যেখানে শুধু চাপাই থাকে তাকে জীবন বলে না।"

মীরা শুনছিল। বৃষ্টির শব্দ কখন বন্ধ হয়ে গেছে। বাতাসের ঝাপটা লাগছিল বারান্দার দিকে।

শব্দটা শোনা যাচ্ছিল। মীরা বলল, "আর শ্যামা?"

সুরপতি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিল। মাথার ওপর হাত তুলল; ছাদের দিকে চেয়ে থাকল। কিছুক্ষণ একইভাবে বসে থেকে হাত নামাল, মাথা সোজা করে মীরার দিকে তাকাল। বলল, "শ্যামা আমার স্ত্রী হতে চেয়েছিল।"

মীরা কেমন অবাক হল। "বোন না!"

"মাসতুতো বোনকে বিয়ে করতে আমার বাধত না। শ্যামারও নয়। তার কাছে অনেক কিছুর কোনো দাম ছিল না। চলতি নীতিটীতি, সংস্কার, নিষেধ সে মানত না। ও ছিল আশ্চর্য রকমের স্বেচ্ছাচারী। শরীর মন কোনো কিছুতেই তার খুঁতখুঁতেপনা ছিল না। নিজেকে ছাড়া শ্যামা অন্য কিছু গ্রাহ্য করত না।" বলতে বলতে সুরপতি থামল।

মীরা দেখছিল, একটা মানুষ কেমন বদলে যায়। এই সুরপতি প্রথম যেদিন এসেছিল সেদিন তাকে দেখে একরকম মনে হয়েছিল মীরার। পরের দিন আর-এক রকম। তারপর মাত্র চার পাঁচটা দিনের মধ্যে সুরপতি কত বদলে গেল। মানুষটা যে বদলাল তা নয়, মীরা ওকে যত বেশী করে চিনছে,

দেখছে—লোকটার কোনো তল পাওয়া যাচ্ছে না। এখন আবার গরম লাগায় গায়ের চাদর আলগা করে দিল মীরা।

সুরপতি শ্যামার কথা ভাবছিল। শ্যামার কোনো কিছুই ভুলে যাবার নয়; সুরপতি শ্যামার প্রায় সবটাই চিনেছিল। নিজের স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা; নিজের প্রয়োজন ও জেদ—শ্যামাকে এমন একটা চেহারা দিয়েছিল যে সুরপতির মনে হত, শ্যামা কোনো ভয়ংকর যাদুকরীর মতন দাঁড়িয়ে আছে। সুরপতি ওকে ভয় পেত।

মীরা কেমন অদ্ভুত গলায় বলল, "শ্যামা কিছু মানত না বলেই আপনি বুঝি মানলেন?"

মাথা নেড়ে সুরপতি বলল, "না, তা নয়। শ্যামা হাতের মুঠো খুলে তার বাইরের সমস্তই দিতে পারত—কিন্তু ভেতরে সে অন্যরকম ছিল। শ্যামা ভাবত, তার পছন্দের পুরুষমানুষ তার কেনা হয়ে থাকবে, তার খেয়ালের চাকর। ও ছিল ভীষণ স্বার্থপর, আত্মসুখী, নিষ্ঠুর। শ্যামা আমায় সমস্ত দিক থেকে গ্রাস করতে চেয়েছিল।" সুরপতি বলতে বলতে কাতর ও বিষণ্ণ হল। থেমে গেল। শেষে দীর্ঘ করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি পালিয়ে এলাম।"

মীরা স্থির হয়ে বসে থাকল। মনে মনে যেন শ্যামার একটা চেহারা গড়ে নেবার চেষ্টা করছিল। অল্পক্ষণ কোনো কথা বলল না মীরা, পরে জিজ্ঞেস করল, "আর আপনার স্ত্রী?"

সুরপতি বলল, "ঘটনাচক্রে বকুল আমার স্ত্রী হয়েছিল। প্রেম ভালবাসা পছন্দের কোনো ব্যাপার নেই। রাঁচিতে হেম মণ্ডলের চামড়ার কারবারে বকুল চামড়ার গুদোম দেখত। হেম মণ্ডলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সে আমার কাছে এসেছিল। বুনো ধরনের মেয়েমানুষ। বছর দেড়েক ছিল—তাতেই আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আমার কাঠের কারবার ডুবতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন হাজার কয়েক টাকা চুরি করে সে পালাল। আমি বাঁচলাম।"

মীরা কিছুক্ষণ সুরপতির মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকল, তারপর মুখ ফেরাল। দেওয়ালে রুমকির ছবি, এখান থেকে দেখা যায় না ছবিটা। হালকা রঙের একটা ক্যালেন্ডার সামান্য তফাতে। কেমন করে যেন কয়েকটা আঁচড় লেগেছে দেওয়ালে। বাইরে বৃষ্টি নেই। কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এখনও বাতাস রয়েছে ঝোড়ো। নিঃশ্বাস ফেলল মীরা বড় করে। সুরপতি যা বলল, এ কী তার ভালবাসার গল্প? যদি ভালবাসার গল্প হয়—তবে মানুষটা কোথাও দাঁড়াল না কেন? কেন ঘর-সংসার করে বসল না?

পরেই মীরার মনে হল, ঘর-সংসার করে বসলেই কি সুখ শান্তি উড়ে এসে জুড়ে বসে? মীরা তো কবেই এই সংসার নিয়ে বসেছে। কিন্তু কেন

সে তৃপ্তি পায় না? কেন তার জীবন এমন বিস্বাদ? দিন কেটে যাচ্ছে অবশ্য। প্রমথ তার কাছে অভ্যাসের মতন, কর্তব্যের মতন। প্রমথ তাকে যথার্থ কোনো আনন্দ দিতে পারে না। কে জানে প্রমথ যদি তার পছন্দের মানুষ হত হয়ত মীরা এরকম হত না। দার্জিলিঙের জামাইবাবু, কিংবা এর ওর সঙ্গে যেরকম মেশামেশি ছিল মীরার, তাতে সে দেখেছে—প্রমথ প্রায় প্রত্যেকের তুলনায় ভোঁতা, ম্যাড়মেড়ে সাধারণ। প্রমথ বউ নিয়ে আদিখ্যেতা করতে পারে, লোকের কাছে তার বরাতজোরে পাওয়া সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়ে ডগমগ হতে পারে, নিজের বাড়ির দায়-দায়িত্ব মীরার কাঁধে চাপিয়ে হালকা নিশ্চিন্ত হতে পারে, কিন্তু প্রমথ বোঝে না—বা জানেই না—তার বউ এতে কৃতকৃতার্থ হয় না। মীরা এমন কিছু চেয়েছিল—যা তার কাছে সত্য হবে। হল কই?

মীরা যেন অনেক দিনের চাপা কোনো বেদনাকে বুকের ওপর ভেসে উঠতে অনুভব করল। করে নিঃশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে। বড় বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ, মলিন দেখাচ্ছিল তার মুখ। কিসের অস্বস্তিবশে কিংবা অন্যমনস্কতার দরুণ চাদরটা খুলে ফেলল।

সুরপতি অন্যমনস্কভাবে আবার সিগারেট ধরাল। হয়ত ভেতরে ভেতরে কোথাও তার স্নায়ু অবসাদে শিথিল হয়ে আসছিল।

দীর্ঘ সময় দুজনেই নীরব। যেন কোনো দূরত্ব যা পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল ক্রমশই তা ঘুচে যাচ্ছে, পরস্পরের কাছাকাছি হয়ে আসছে।

মীরা হঠাৎ বলল, "আপনি বড় বেশী খুঁতখুঁতে। এত খুঁতখুঁতে হলে সংসারে কিছু পাওয়া যায় না।"

সুরপতি মীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "বোধ হয় তাই।...আমি নিজেই মাঝে মাঝে ভাবি এত খুঁতখুঁত করে কিবা লাভ হল।"

"করলেন কেন?"

মুখের কাছে ধোঁয়ার ঝাপসা কেটে যাবার পর সুরপতি বলল, "কী জানি; আমি আমার চোখ ও মনের পছন্দ মতন কাউকে খুঁজেছিলাম। শুনলে হয়ত ভাববেন—ছেলেমানুষি কথা বলছি। তা নয়। আমি বোধ হয় নিজের রুচি-মতন সেই কবে—আমার প্রথম যৌবনে, সৌন্দর্য ও ভালবাসা খুঁজেছিলাম। টুকরো টুকরো করে কিছু পেতে চাইনি। কাজ চালাবার মতন করে কোনো মেয়েকে পাওয়া আমার সইতো না।"

"এতে লাভ কী হল? কিছুই তো পেলেন না।"

"কপাল মন্দ" সুরপতি ম্লান করে হাসল।

মীরা কিছু ভাবছিল। বলল, "আপনি কি সত্যিই আমায় ভালবেসেছিলেন?"

সুরপতি মীরার চোখের তারার দিকে, সেই ব্যাকুল অথচ বিষণ্ণ দৃষ্টির

দিকে তাকিয়ে বলল,"কেউ জোর করে ভালবাসার কথা বলতে পারে না। বো
হয় বেসেছিলাম।"

কি যেন মীরার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগাল। সিরসির করে উঠল। বুকে
তলায় কেমন গলে যাচ্ছিল তার সমস্ত অনুভূতি। মীরা বলল, "আমি বে
বাসি নি।"

"তবু আপনি আমার ঘরে মাঝরাতে আসেন!"

মীরা এবার আর চমকে উঠল না; অবাকও হল না। বুকের মধ্যে চাপা
শ্বাস ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কষ্ট হল। সামান্য সময় যেন সেই কষ্টটা
সামলাবার জন্যে মুখ নীচু করে থাকল। মীরা বুঝতে পারল না।—কেন
সে সুরপতির ঘরে গিয়েছিল কাল? আগের দিন শেষ রাতে ঘুম ভেঙে উঠে
আসা এক কথা। ঘরে ফিরে যাবার সময় সুরপতির ঘরের দরজা খোলা দেখে
তার কৌতূহল ও দুশ্চিন্তা হয়েছিল। কিন্তু কাল মাঝরাতে কেন গিয়েছিল
মীরা? কেন চোরের মতন সুরপতির বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল? কেন
এক দুর্বোধ্য বেদনায় সে গুমরে কেঁদে উঠেছিল পাছে সুরপতির ঘুম ভেঙে
যায়—পালিয়ে এসে বারান্দায় বসে কেঁদেছে! কেন এমন হল? মীরা কী
খুঁজতে, কাকে দেখতে এত সন্তর্পণে সুরপতির ঘরে ঢুকেছিল?

স্তব্ধ, নিঃসাড় ঘরে মীরা মুখ নীচু করে বসে থাকল। সুরপতিও নীরব।

খুবই আচমকা এই স্তব্ধতা ভেঙে কলিং বেল বেজে উঠল। মীরা চমকে
উঠেছিল। বেল বাজছে তো বাজছেই। বিশ্রী, কর্কশ, বীভৎসভাবে বেলটা
বাজতে লাগল।

মীরা উঠল। বিরক্ত হয়েছে ভীষণ।

প্রমথ ফিরেছে।

সুরপতি ঘরে বসেই বুঝতে পারল প্রমথ ফিরে এল। দরজা বন্ধর শব্দ
কি যেন বলল প্রমথ, শোনা গেল না। প্রমথ বসার ঘর থেকে প্যাসেজে এসেই
সুরপতির ঘরের দিকে আসছে; পায়ের শব্দ পেল সুরপতি।

প্রমথ ঘর এল। মাথার চুল উসকোখুসকো জলেঝড়ে উদভ্রান্ত যত না
তার বেশী তাকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। অনেকটা মদ খেয়েছে। চোখ লাল।
পাতাগুলো ফুলে উঠেছে। মুখ টসটস করছিল। পায়ে জোর নেই, টলছে।
হেঁচকি তুলছিল।

প্রমথ ঘরের চৌকাট পেরিয়ে দু পা এসে দাঁড়াল। সুরপতিকে দেখতে
লাগল।

সুরপতি প্রমথর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, কিসের যেন প্রচণ্ড
আক্রোশ; ঘৃণা, তিক্ততা নিয়ে প্রমথ দাঁড়িয়ে আছে।

প্রমথ একবার বিছানার দিকে তাকাল। মীরার গায়ের চাদর পড়ে আছে।

সুরপতি বলল, "তোর এত দেরী হল?"

প্রমথ কথা বলল না। মাথা নাড়তে লাগল।

কাচের গ্লাসে ভরতি করে জল এনে মীরা প্রমথর পাশে দাঁড়াল। "নাও।"

প্রমথ মুখ ফিরিয়ে দেখল মীরাকে। জল নিল।

মদের গন্ধ বুঝি সহ্য হচ্ছিল না মীরার, প্রমথর পাশ থেকে সরে দু পা এগিয়ে এল।

হেঁচকি তুলল প্রমথ। জল খেল সামান্য। তারপর সুরপতির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "তুই শালা আমার বউকে—" বলতে না বলতে, জড়ানো কথার মধ্যেই প্রমথ হাত তুলল। টলে যাচ্ছিল প্রমথ। ক্ষিপ্ত, হিংস্রভাবে হাত তুলে একেবারেই আচমকা হাতের গ্লাস ছুঁড়ে মারল সুরপতিকে।

সুরপতি চোখমুখ বাঁচাবার জন্যে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। গ্লাসটা তার মাথায় এসে লাগল। আওয়াজ হল ঠক্ করে, জোরে। কাচের টুকরো আর জল ছড়িয়ে পড়ল সুরপতির চারপাশে।

মীরা শুধু সুরপতির অস্ফুট যন্ত্রণার স্বর শুনতে পেল। এত আচমকা, অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল যে সে একেবারেই বিমূঢ়, নির্বাক।

প্রমথ খেপার মতন মাতাল গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "শালা স্কাউন্ড্রেল, বদমাশ, শুয়ারের বাচ্চা। তোকে বন্ধু বলে ঘরে এনেছিলাম। তুইও শালা ওই হারামজাদা মাগীটার সঙ্গে...ছি ছি ছি—আমার মুখ দেখাবার কিছু থাকল না, ছি ছি।"

প্রমথ কিছু গ্রাহ্য করল না, চেঁচাতে চেঁচাতে টলতে টলতে বাইরে চলে গেল।

সুরপতি মাথা থেকে হাত নামাল। হাতময় রক্ত।

মীরা নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়েছিল। দ্রুত পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল। সুরপতির হাতে রক্ত। কানের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

বিহ্বল, ভীত হয়ে মীরা তাড়াতাড়ি সুরপতির মাথা ধরে ফেলল। যন্ত্রণায় কেমন নীল হয়ে গেছে সুরপতির মুখ। চোখ বন্ধ করে আছে। তার কোলের ওপর, চেয়ারে, পায়ের কাছে ভাঙা কাচের টুকরো।

মীরা শিউরে উঠল। প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, "ইস—স, মাথাটা গেছে।" বলতে বলতে দিশেহারা হয়ে বাইরে ছুটে গেল।

সুরপতি হাতটা আবার মাথায় তুলল। নামাল। দেখল তার কপাল বেয়ে গড়িয়ে রক্ত পড়ছে, গালে নেমে এল। কানের পাশ দিয়ে গড়ানো রক্ত ঘাড়ের দিকে নামছে।

ততক্ষণে মীরা আবার এসে গেছে। জল আর কাপড়ের টুকরো নিয়ে, তুলো নিয়ে।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান—আমি দেখছি—" মীরা সুরপতির মাথার চুল সরিয়ে সরিয়ে আঘাতটা খুঁজছিল। রক্তে চুল জড়িয়ে গেছে, জলে ভেজা মাথা।

বড় বেশী রক্ত পড়ছিল। মীরা সুরপতিকে বলল, "একটু উঠুন, নীচে নেমে বসুন।"

সুরপতির কোল থেকে কাচের টুকরো ফেলে দিল মীরা। হাত ধরে উঠিয়ে মাটিতে বসাল।

সুরপতি চোখ বন্ধ করে বসে থাকল। যন্ত্রণা যেন স্নায়ু থেকে আরও কোনো গভীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

মীরা মাথা ধুইয়ে দিচ্ছিল, রক্ত পরিষ্কার করছিল। সুরপতির কপাল, কান, গলা, হাত পরিষ্কার করে দিতে দিতে মীরা থরথর করে কাঁপছিল, কাঁদছিল। হঠাৎ মীরার মনে পড়ল, মাত্র পরশু সে স্বপ্ন দেখেছে, সুরপতির মাথায় সে আবির মাখিয়ে দিয়েছিল, অথচ আবিরের লাল নয়—মাথা চুঁইয়ে, কান, কপাল গড়িয়ে শুধু রক্তই পড়ছিল। সুরপতির মুখ, গলা বেয়ে রক্ত পড়তে পড়তে জামা ভিজে গেল। মীরা এত রক্ত দেখে নি। সে দিশেহারা হয়ে ভয় পেয়ে সুরপতিকে কুয়োতলায় নিয়ে যেতে চাইছিল। জল ঢেলে পরিষ্কার করে দেবে।

স্বপ্নটা সেখানেই ভেঙে গিয়েছিল। ভয় পেয়েছিল মীরা। কে জানত সেই স্বপ্ন মাত্র দুদিন পরেই এমন করে সত্য হয়ে দেখা দেবে। মীরা স্বপ্নে যত ব্যাকুল, বিভ্রান্ত হয়েছিল—এখন তার চেয়ে বেশী বিমূঢ় ও কাতর বোধ করছে। মীরা জানে না, কোন গভীরমত দুঃখ ও হাহাকার বুকে নিয়ে আজ সে এত যত্ন করে, নিজেরই দেওয়া কোনো আঘাতের মতন সুরপতির এই আঘাতকে শুশ্রূষা করছে।

সুরপতি দুর্বল গলায় বলল, "ছেড়ে দিন। আমি বরং কোনো ডাক্তারখানাই যাই।"

"না। এখনও রক্ত বন্ধ হয় নি।"

"হয়ে যাবে।" বলে যন্ত্রণা চাপার শব্দ করল সুরপতি মুখে। বলল, "আমার এমনই কপাল—একই জায়গায় বার বার লাগছে।" সুরপতির মনে হচ্ছিল—সেই প্রথম যৌবনে ঠিক ওই জায়গায় নীলেন্দু তাকে মেরেছিল পরিণত যৌবনে শ্যামাও রেগে গিয়ে কাচের গ্লাস ছুঁড়ে তাকে ওই জায়গাটাতেই আঘাত করেছিল। আর আজ প্রমথ মারল। প্রতিবার একই জায়গায় কেন এই আঘাত? কেন এই রক্তপাত?

মীরা এক হাতে কাটা জায়গায় একরাশ তুলো প্রাণপণ শক্তিতে চেপে